ধূলি-ধূসর

প্রেমেন্দ্র মিত্র

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

এই লেখকের—

পাঁক
মিছিল
উপনয়ন
কুয়াসা
বেনামী বন্দর
পুতুল ও প্রতিমা
পঞ্চশর
মৃত্তিকা
অরণ্যপথ
সাগর থেকে ফেরা
অফুরন্ত
প্রথমা
সম্রাট
স্বনির্বাচিত গল্প
শ্রেষ্ঠ কবিতা
—ইত্যাদি

একটি রাত্রি

বিংশ শতাব্দীর এই অবিশ্বাস, সংশয় ও হতাশার যুগে একটি পতিত অভিশপ্ত আত্মার উদ্ধারের কাহিনী বলতে যাচ্ছি শুনলে অনেকের নাসা কুঞ্চিত, অনেকের চোখ সকৌতুক বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠবে জানি।

কিন্তু সত্যই সুব্রতের জীবনে এমনি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে।

এযুগে আমরা সবাই অল্প বিস্তর অভিশপ্ত, পতিত। আমাদের বিবর্ণ জীবনে মৃত্যুর হিমস্পর্শ লেগেছে। আমাদের আকাশ শূন্য হয়ে গেছে, পৃথিবী যান্ত্রিক প্রাত্যহিকতায় কঠিন।

এই মৃত্যু থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে কি তপস্যা আমরা করতে পারি? তপস্যায় বিশ্বাসও আমরা হারিয়েছি। শুধু একদিন সুব্রতের মত দৈবের অযাচিত অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহে অন্ধকার বিদীর্ণ হয়ে যেতে পারে বিদ্যুৎ-ছটায়, এইটুকুই আমাদের আশা।

কলকাতার ওপর সেদিন শীতের সন্ধ্যার গাঢ় কুয়াসা নেমেছে।

কুয়াসা নয়—তার ছলনা। ধোঁয়া ধূলির ষড়যন্ত্র। কিন্তু তার জন্যেও বুঝি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। রূঢ় বাস্তবতাকে মুছে দিয়ে সে কুয়াসা রহস্যের ইঙ্গিত এনেছে ক্লান্ত নগরের চোখে। দিনের গ্লানির কথা দিয়েছে ভুলিয়ে। সে কুয়াসার ছোঁয়ায়, মনে হয়, সমস্ত রুক্ষতার আড়ালে নগরের যে অপরূপ হৃদয় আমাদের কাছে গোপন থাকে তাই যেন অস্পষ্ট অন্ধকারে অকস্মাৎ নিজেকে প্রকাশ করেছে।

ধূলি-ধূসর

এই কুয়াসা আমাদের মনের ওপরও নামে বুঝি; প্রতিদিনের তুচ্ছ ঘটনার শৃঙ্খল থেকে আমরা পাই মুক্তি। মনে হয় দিনের পৃথিবী এই মায়ালোকে আর আমাদের অনুসরণ করতে পারেনি। অস্তিত্বের আর কোন পৃষ্ঠায় আমরা উত্তীর্ণ হয়েছি।

খানিকক্ষণের জন্য এবার নিজেদের ভুলতে পারব যেন। ভোলাই বা কেন, সেই হয়ত সত্যকার জানা। দিনের আলোয় নিজেদের সত্তার স্পষ্ট অথচ সীমাবদ্ধ যে অর্থ আমরা পেয়েছি তাই অসম্পূর্ণ। রাত্রি সে অর্থকে প্রসারিত করে দিয়েছে।

সুব্রতের অন্ততঃ তাই মনে হয়। এই কুয়াসাচ্ছন্ন নগরের পথে নিরুদ্দেশ্য ভাবে ঘুরে বেড়াতে তার ভাল লাগে। জীবনের কাহিনী যেখানে স্পষ্টভাবে লেখা সেইদিনের পাতাগুলি মুড়ে সে যেন আর কোন অস্তিত্বের আভাস পায় এই অন্ধকারে।

যেন কোথায় আছে অনাবিষ্কৃত ব্যাখ্যা জীবনের। পৃথিবী যখন অন্ধকারে নিজের সীমা লঙ্ঘন করে তারকালোক পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় সেই অপরূপ অবসরে সে-ব্যাখ্যার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

সে-ইঙ্গিত সমস্ত মন দিয়ে গ্রহণ করবার শক্তি বুঝি তার নেই। তবু সে অনুভব করতে ভালবাসে নিজের এই অপ্রত্যাশিত বিস্তৃতি, চারিধারের রহস্য-সঙ্কেতের মাঝে।

সুব্রতকে সামান্য একটু পরিচিত করবার চেষ্টা করা যাক। বাইরের পরিচয় নয় ভেতরের—নিজেকে সুব্রত যেমন জানে।

সুব্রত যেখানে এসে পৌচেছে, সেখানে অস্তমান যৌবনের আলো এখনো আছে, কিন্তু নেই উজ্জ্বলতা। দেহের নয় মনের যৌবনই এসেছে তার ম্লান হয়ে। সে ক্লান্ত—আত্মার দুঃসহ ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন। আশা, আদর্শ, প্রেরণার ভগ্নস্তূপের মধ্যে সে বাস করছে। প্রতিদিনের সূর্য্যোদয়কে সাগ্রহে অভিনন্দিত করবার উৎসাহ আর তার নেই।

ধূলি-ধূসর

এমনভাবে জীবনের ভগ্নস্তূপের মধ্যেই নির্ব্বিকারভাবে আরো অনেকে বাস করে। কোন অসন্তোষ, কোন অভাবের বেদনা তাদের থাকে না। যৌবন যে ব্যর্থ স্বপ্ন ও ভগ্ন-আশার জঞ্জাল তার যাত্রাপথে ফেলে চলে যায় তার নিয়ে জোড়াতালি দিয়ে তারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে পরিতৃপ্ত ভাবে। তারা নিজেদের পরিচয়ও জানে না।

কিন্তু সুব্রত তেমন নয়। সে জানে যে সৃষ্টি তার কাছে বিবর্ণ হয়ে এসেছে মনে আর তার রঙ নেই বলে। তার মন ধূসর হতাশায় আচ্ছন্ন। অনেক ভাবাবেগ, অনেক অনুভূতির প্রত্যন্ত প্রদেশ ঘুরে এসেও সে কিছু পায়নি সঞ্চয় করে রাখবার মত। সমস্ত জীবনকে ছন্দোবদ্ধ ভাবে বেঁধে রাখা যায় এমন কোন বিশ্বাসের সম্বল তার নেই।

মনের এই নীরব নিরবচ্ছিন্ন উষরতার মধ্যে হাঁপিয়ে উঠতে হয় একদিন।

রাত্রির এই কুয়াসা-স্নিগ্ধ সান্ত্বনার জন্যে তখন বেরুতে হয় পথে। হৌক তা কুয়াসার ছলনা মাত্র।

সুব্রত এরিমধ্যে অনেকখানি ঘুরেছে উদ্দেশ্যহীনভাবে। কলকাতার রাস্তাগুলি এক একটি আলাদা জগৎ—তাদের নিজস্ব বিভিন্ন রূপ আছে—বুঝি পৃথক আত্মাও আছে। দিনের আলোয় প্রয়োজনের শাসনে তারা এক হয়ে থাকে, তারপর রাত্রির সম্মোহনে নিজেদের তারা উন্মুক্ত করে দেয়। তখনই পাওয়া যায় তাদের সত্যকার পরিচয়।

হঠাৎ দেখতে পাওয়া যায় দীর্ঘ একটি খাড়া প্রাচীর সমেত বাড়ী কোন রাস্তাকে অদ্ভুত একটি ব্যঞ্জনা দিয়েছে। দিনের বেলা যে গাছ চোখেও পড়েনি রাত্রে হঠাৎ সে-ই কোন পথের কর্ম্মস্থল অধিকার করে তার অপরূপ রহস্য করেছে উদ্ঘাটিত।

বাড়ীগুলির রেখা ও আলো-ছায়ার বিচিত্র বিন্যাসে এক একটি রাস্তার রূপ ও অর্থ গিয়েছে বদলে।

ধূলি-ধূসর

নির্জ্জন কয়েকটা রাস্তা ঘুরে স্থব্রত তখন বুঝি চৌরঙ্গির কাছাকাছি এসে পড়েছে। এ রাস্তাটিও নির্জ্জন। নগরের বর্ণাঢ্য উচ্ছলিত স্রোত আর খানিক দূরেই যে ফেনায়িত হয়ে উঠেছে জনতায় আলোয়, কলরবে, এখান থেকে তা বোঝা কঠিন শাস্ত গাঢ় ছায়াচ্ছন্ন পথ তুধারের বড় বড় ঝাঁকড়া গাছের রহস্ত-স্পর্শ নিয়ে সামনে এগিয়ে গেছে যেন অপরূপ কোন মধুর কাহিনী-লোকে।

স্থব্রতকে সে পথ নিত্যকার বিবর্ণ ক্লান্ত পৃথিবী থেকে সত্যই জীবনের আর এক পৃষ্ঠায় নিয়ে গেল।

অনেক দূরে দূরে এক একটি আলোর স্তম্ভ। সে আলোর সঙ্গে যেন অন্ধকারের কোন বিরোধ নেই। সে আলো কিছুকে অতি স্পষ্ট করে তুলতে চায় না, সে অন্ধকার কিছুকে একেবারে ঢেকে রাখে না। আলো অন্ধকার মিলে একটি তরল অপরূপ অস্পষ্টতা সৃষ্টি করেছে।

স্থব্রত খানিক এগিয়েই থমকে দাঁড়াল। কে যেন পথের ধারে দাঁড়িয়ে। অস্পষ্টতা যেখানে গাছের ছায়ায় গাঢ় হয়ে উঠেছে সেখানে কে যেন তাকে থামতে ইসারা করলে।

আবছায়া নারীমূর্ত্তি—যেন এই পথেরই আত্মা মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে।

জানি পাঠক আর আমার সঙ্গে এগুতে নারাজ।

কলকাতার রাস্তায় যেখানে খুসী একটি সঙ্কেতময়ী অপরিচিত মেয়েকে গল্পের প্রয়োজনে হাজির করার অপরাধ তাঁরা ক্ষমা করতে প্রস্তুত নন।

তবু সত্যের খাতিরে আমায় এগিয়ে যেতেই হবে। তাছাড়া মেয়েটি অপরিচিত নয়।

স্থব্রতও তা বুঝতে পারলে মেয়েটি আলোর কাছে এগিয়ে আসার পর।

"তুমি!"

মেয়েটির মুখ ভাল করে এখনো দেখা না যাক, তার শরীরের হিল্লোলটি বোঝা গেল এ কথায়। "আমি-ই! আমায় এখানে দেখবার আশা নিশ্চয়ই করনি।"

"করা কি স্বাভাবিক!"

"না, কিন্তু আমায় এখানে কেন, কোথাও দেখবার আশা তুমি করনি। দেখতে চাওনি।"

সুব্রত নীরব।

মেয়েটি বল্লে—"তা জানতাম!"

তারা দুজনে এবার চলতে সুরু করেছে।

মেয়েটি আবার বল্লে—"বিশ্বাস করতে পার, আমিও তোমার জন্যে ওৎ পেতে ছিলাম না ওই নির্জ্জন রাস্তায়।"

"বিশ্বাস না করতে পারলেই খুসী হতাম যে!"

"তা হতে পারে। তোমার অহঙ্কারের সীমা নেই!"

"সে অহঙ্কারকে তুমিই যে প্রশ্রয় দিচ্ছ মীরা!"

"প্রশ্রয়ের অপেক্ষা তুমি রাখ না।"

"আমার ওপর বড় বেশী অবিচার করছ নাকি?"

মীরা একটু শুষ্ক হাসি হাসল।

"এতদিন বাদে দেখা হওয়ার পর আমাদের আলাপটা ঠিক্ সঙ্গত হচ্ছেনা বোধ হয়।"

"দেখা হওয়াটাই যে অসঙ্গত। সুতরাং সেটার ওপর জোর নাই দিলে। আর এইখানেই আমায় বিদায় নিতে হচ্ছে।"

কথা বলতে বলতে তারা অনেক দূরে এসে পড়েছে—পথের নির্জ্জনতা এবার শেষ হয়েছে। চারিধারে উজ্জ্বল আলো আর জনতা।

সুব্রত হঠাৎ বাঁ হাতটা বাড়িয়ে মীরার হাতটা ধরে ফেল্লে। হেসে বল্লে,—"তা হয়না মীরা। এমন আরম্ভের আচমকা এমন শেষ হওয়ার কথা কোন বইয়ে লেখেনা।"

মীরা এবার না হেসে বুঝি পারলে না।

জিজ্ঞাসা করলে—"কোথায়?"

"কোন রেস্তরাঁয়।"

"না"।

"তবে চল ময়দানে!"

মীরা কোন উত্তর দিলেনা। বড় রাস্তায় পড়বার পর একটা ট্যাক্সি খানিক আগে থাকতেই শ্বাপদের মত তাদের পিছু নিয়েছে। সুব্রতের ইসারায় কাছে এসে দাঁড়াল।

ট্যাক্সির ভেতর বসে সুব্রত বুঝি আমাদের একটু অবাক করে দিলে। তাকে এতক্ষণ অত্যন্ত সংযত বলেই মনে হয়েছে।

তার বাঁহাতটা মীরার পিঠের পেছন দিয়ে লুকিয়ে কখন এগিয়ে গেছে। হঠাৎ মীরা একটা আকর্ষণ অনুভব করলে।

"মীরা ক্ষমা করো, তোমায় আজ অপরূপ দেখাচ্ছে!"

মীরা কিছু না বলে ধীরে ধীরে সুব্রতের হাতটা সরিয়ে একটু সরে বসল।

সুব্রত নিঃশব্দে খানিকক্ষণ রইল বসে, তার পর বল্লে, "এবারে আমি কৈফিয়ৎ দেবার জন্য প্রস্তুত!"

"কৈফিয়ৎ নেবার জন্যে আমি আসিনি—" অত্যন্ত গম্ভীর স্বর—একটু তিক্ত।

সুব্রত হাসল; কিন্তু তার হাসির রঙ বদলে গেছে।—"তা জানি মীরা, কিন্তু গরজ আমার নিজেরই!"

মীরার এবারকার জবাবটা যেন সুব্রতের মুখের ওপর চাবুকের মত লাগল। মীরা কঠিন স্বরে বল্লে, "কিসের জন্যে! একটু ভণিতা না করলে হঠাৎ অভিনয়ের পালা সুরু হওয়া বেমানান হয় বলে ত! তুমি ওটুকু উহ্য রেখেই সুরু করতে পার!"

বিবর্ণ মুখে সুব্রত অনেকক্ষণ বুঝি চুপ করে বসে রইল। মীরাও কথাটা বলবার পর মুখ ফিরিয়ে বসেছে।

ট্যাক্সি চৌরঙ্গিতে এসে পড়েছে এরিমধ্যে। দ্রুত তাদের মুখের ওপর দিয়ে রাস্তার আলো ছায়া সরে যাচ্ছে। মুখের ভাব কারুর কিছু বুঝবার যো নেই।

তারা যেন পাশাপাশি থেকেও বহুদূরে সরে গেছে পরস্পরের কাছ থেকে। দুস্তর এই ব্যবধান। তাদের দুধার দিয়ে পথ বয়ে যাচ্ছে নদীর মত; মাঝখান দিয়ে সময়ের স্রোত। সে স্রোত তাদের জীবনে কি নূতন কোন উপলব্ধি এনে দিলে। বলা যাচ্ছে না এখনও।

অনেকক্ষণ বাদে সুব্রত বল্লে,—"ময়দানে যাবার দরকার নেই, মীরা, চল তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।" তারপর একটু হাসবার চেষ্টা করে বল্লে,—"কোথায় তুমি যাচ্ছিলে, কবে তুমি এলে, তাইত জিজ্ঞাসা করা হয়নি এতক্ষণ!"

"তার কোন দরকার ছিল না।" এখনও স্বরে একটু ঝাঁঝ আছে।

সুব্রত সে কথা যে শুনতে পায়নি; জিজ্ঞাসা করলে আবার,—"কোথায় তখন যাচ্ছিলে?"

"কোথাও না!"

"তার মানে!"

"কাল সবে কলকাতায় এসেছি পিসিমাদের বাড়ী। তাঁদের সঙ্গেই বায়স্কোপে গিছলাম। ভাল লাগলো না বলে মাঝখানে উঠে বেরিয়ে পড়েছিলাম।"

"আশ্চর্য্য! তাঁরা কি ভাবছেন!"

"ভালো কিচ্ছু ভাবছেন না বোধ হয়!"

"না তা বলছিনা, খুব হয়ত উদ্বিগ্ন হয়েছেন।"

"তোমার সঙ্গে আছি জানলে বোধ হয় হতেন না!"

ব্যথিত স্বরে সুব্রত বল্লে—"আমায় আঘাত দিতে তুমি অবশ্য পার মীরা।"

"তাই নাকি!"

ব্যঙ্গের স্বর উপেক্ষা করে সুব্রত বল্লে,—"তুমি আমার পরিচয় বোধ হয় ঠিকই জেনেছ মীরা! এক যায়গায় ধরা পড়তেই হয়। তবু এখন আমার মনে হচ্ছে আমার আরেকটা পরিচয় আছে, আর সেইটাই আসল সেটা এখনও আবিষ্কার করবার সময় আছে।"

"বুঝতে পারলাম না।"

"দাঁড়াও বোঝাচ্ছি! কিন্তু আগে ট্যাক্সি কোথায় যাবে বল! তোমার পিসিমার বাড়ী না বায়স্কোপে?"

মীরা খানিক চুপ করে থেকে বল্লে—"ময়দানেই যাব!"

"না রাত হচ্ছে! তোমায় না দেখতে পেয়ে ওঁরা নিশ্চয় খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। সিনেমায় না হয় তোমাদের বাড়ীতে চল।"

মীরার কোন উত্তর পাওয়া গেলনা।

"কি ভাবছ?" জিজ্ঞাসা করলে সুব্রত।

"ভাবছি, তোমার এমন একটা সুযোগ নষ্ট হ'ল।"

"নষ্ট হয়নি ত!"

"হেঁয়ালিটা আমার কাছে দুর্ব্বোধ।"

"হেঁয়ালি নয় মীরা। তুমি হয়ত শুনলে হাসবে! কিন্তু তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া নয়, এ আমার ফিরে যাবার চেষ্টা!

"না হেসে পারলাম না। অত রঙ দিয়ে কথা বলা তোমায় মানায় না!"

"সব রঙ উজাড় করেও প্রকাশ করা যায় না এমন কথাও বলার দিন জীবনে আসে। হয়ত আমার এসেছে।"

"অবহেলা সহ্য হয়েছিল উপহাসটা হচ্ছে না।"

"উপহাস নয় মীরা। আমার নিজেরেই বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না, কিন্তু তোমাকে সত্য করে, ফিরে পাওয়ার জন্যই ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।" সুব্রতের গলার স্বর সত্যি ভারি হয়ে এসেছে আবেগে।

মীরা ম্লান একটু হাসল—"কিন্তু এক ঘণ্টা আগে আমিত তোমার মনের সুদূর কোন কোণেও ছিলাম না!"

"না, ছিলেনা। কিন্তু এখন আছ এবং সেই থাকার কাছে সমস্ত অতীত মিথ্যা হয়ে গেছে জেনো।"

"এসব সেই নির্জ্জন রাস্তা আর হঠাৎ সাক্ষাতের যাদু নয় ত!"

ধূলি-ধূসর

"তাই যদি হয় ক্ষতি কি! সে যাদু সমস্ত পৃথিবী আর সমস্ত কালকে ছুঁয়ে দিক্।"

"বড্ড চড়া রঙ তোমার কথায়!"

"মনের রঙ আরো যে চড়া!"……

সে রাত্রে সুব্রত ও মীরার কাছে ওই খানেই আমরা বিদায় নেব। এবং তারপরের সকালে একেবারে উঠব গিয়ে সুব্রতের ঘরে।

ঘরটা অত্যন্ত প্রশস্ত। এধার ওধার কয়েকবার পায়চারী করলে প্রাতর্ভ্রমণের কাজ সারা হয়। এত বড় ঘরকে কিছুতেই যেন আপনার করে নেওয়া যায় না। এ ঘরে বড় বেশী ফাঁক থেকে যায়। অন্তরঙ্গ নয় এঘর, যেন উদাসীন।

সুব্রতের এই ঔদাসীন্য এতদিন বাজেনি। কিছুই তার বাজেনি। তার মন ছিল নিঃসাড়। প্রাণের উৎসই তার বুঝি গিয়েছিল শুকিয়ে। আর নিজের এই নিয়তিকে সে স্বীকার করে নিয়েছিল। এমনি করে তাকে টেনে চলতে হবে দিনের পর দিন অস্তিত্বের শ্রান্ত ধারা। সে ধারা আর উঠবে না আবর্ত্তে ফেনিল হয়ে, প্রপাত হয়ে পড়বেনা ঝাঁপিয়ে অনিশ্চিত কোন ভবিষ্যতে, আর আসবেনা তার স্রোতে বন্যাবেগ। শুধু মন্থর ভাবে মনের ধূসরতায় সে যাবে ভেসে।

পৃথিবীর সাথে তার পরিচয় পর্দ্দার আড়াল থেকে অস্পষ্টভাবে, কোথাও উলঙ্গ সাক্ষাৎ হবেনা আর কোন সত্যের আর কোন সত্তার সঙ্গে। আত্মার গহনতায় অসীম তার হতাশা।

কিন্তু হঠাৎ কি আলো এল অন্ধকার বিদীর্ণ করে। মনের অন্ধকার সাগর উঠেছে দুলে। অন্ধকার ঢেউ ভেঙ্গে পড়ছে ফেনায়িত দীপ্তিতে।

শুধু একটি মানুষের আকস্মিক আবির্ভাবে তার জীবনে এল এই অপরূপ জোয়ার! কোষ-মুক্ত তরবারের মত তার চেতনা উঠলো ঝিলিক দিয়ে!

কোন ঘটনা যায় মনের ওপর দিয়ে উদাসীন ভাবে চলে' আর কোন ঘটনা আসে চারিদিকে বিদ্যুৎস্পন্দন তুলে' অকল্পিত সম্ভাবনার। কাল রাতের ঘটনা

যেন তাই। সাক্ষাৎ নয়, ছুটি সত্তার সে বুঝি সজ্ঘর্ষ। অন্ধকার আকাশের মৃত তারকাপিণ্ডও উঠেছে বহ্নি-দীপ্ত হয়ে সে সজ্ঘর্ষে।

শুধু প্রেম বলেত ব্যাখ্যা করা যায়না সত্তার এই সঙ্ঘাতকে, তার চেয়ে বেশী কিছু। বুঝি তার চেয়ে ভয়ঙ্কর কিছু!

সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা এই যে মীরাকে সে এতদিন অনায়াসে ভুলেই ছিল।

"তোমার মনের কোন সুদূর কোণেও আমি ছিলাম না।"

মিথ্যা সে ত বলেনি। বহুজনের ভীড়ে অতীতের স্মৃতিতে সে ছিল মিশে। তারপর একি আবির্ভাব! সত্যিই অতীত স্মৃতির সেই সদ্য কৈশোরাতিক্রান্তা উদ্ধত চঞ্চল প্রকৃতির মেয়েটির সঙ্গে এ-মীরাকে কিছুতেই মেলান যায়না। সে মীরা তখনও নারী হয়ে ওঠেনি। তাকে অবহেলা করবার ইচ্ছা হয়নি সুব্রতের, জয় করবার উৎসাহও নয়, আলগোছে পথের পরিচয় হিসাবে সে তাকে সম্ভাষণ করেছে অর্দ্ধ উদাসীন ভাবে, তারপর গিয়েছে ভুলে। মীরা তখন সঙ্গী হিসাবে উপভোগ্য। নারীত্বের আভাস তার ভেতর যে-টুকু ছিল তাতে মন স্নিগ্ধ করে রাখে কিন্তু অতিমাত্রায় সচেতন হতে বাধ্য করেনা। ছেলেমানুষ হিসাবে তার ওপর খানকটা মুরুব্বীয়ানার ভাব থাকে অথচ একরকম সুন্দরী মেয়ে হিসাবে তার সঙ্গ ভালোই লাগে। কিন্তু ভালো লাগবার জন্যে মীরা নিজে থেকে সেদিন বিশেষ চেষ্টা করেছে বলে মনে হয়না।

যা ধারালো তরবারি হয়ে উঠবে সে ইস্পাতের পরিচয় তখনই বুঝি প্রকাশ পেয়েছিল।

পাতলা একটি মেয়ে, দেহ দীর্ঘ হয়ে উঠেছে উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত ফোয়ারার মত প্রথম যৌবনের প্রেরণায়, পায়নি এখনো সৌষ্ঠবের পূর্ণতা। তীক্ষ্ণতা তার চোখে, তীক্ষ্ণতা তার মুখের কথায়। ঘা না দিয়ে কথা কয়না, বিশেষ করে সুব্রতকে আহত করার চেষ্টায় তার একটা যেন বিশেষ আনন্দ আছে।

ভালোই লাগত অদ্ভুত তার এই বিরুদ্ধতা।

মীরার বাবা তখন মীর্জ্জাপুরে থাকেন।

ধূলি-ধূসর

শীতের শেষ, দুপুরের হাওয়ায় বেশ তাপ আছে। তারা চলেছে "টাণ্ড্রা ফল্‌সে" পিকনিক করতে। পরিকল্পনাটা মীরার দিদি ও জামাইবাবুর। তাঁরা কয়েক দিনের জন্যে তখন সেখানে বেড়াতে এসেছেন।

তখন সুব্রত বিন্ধ্যাচলে থাকে, স্বাস্থ্যের জন্য নয়, কাজের অছিলায়। সেও একবার কাজে লাগার চেষ্টা করছে। বিন্ধ্যাচলে সে একটা স্যানাটোরিয়াম গড়বার কল্পনা করছে। সেই সূত্রেই মীরার বাবার সঙ্গে আলাপ। মীরার বাবা তখন মীর্জ্জাপুরের সরকারী ডাক্তার। আলাপ থেকে গভীর ঘনিষ্ঠতা হতে দেরী হয়নি। সুব্রতের সে বিষয়ে সহজাত পটুত্ব ছিল।

কিন্তু মীরা সেদিন তার দৃষ্টির সীমার মধ্যে ছিল, লক্ষ্যের বিষয় নয়। চোখ দিয়ে সে দেখেছে মীরাকে, মন দিয়ে টের পায়নি। তাকে লক্ষ্য করল ভাল করে বুঝি পিক্‌নিকের দিন। মনোযোগ দেবার সেদিন নানা দিক দিয়ে সুবিধে হয়েছিল —সময়টা এবং স্থানটা অনুকূল, হাতের কাছে আর কেউ নেই। দল বেঁধে সবাই এদিক ওদিক সরে পড়েছে। কেমন করে মীরাই শুধু দলছাড়া হয়ে পড়েছিল কে জানে।

পিক্‌নিক্ নামেই। টাঙ্গায় করে ষোড়শোপচারে রান্নার উপকরণ এসেছে। এসেছে ঠাকুর চাকর দাসী। দিদি ও জামাইবাবু গেছেন যেখান থেকে সহরে জল সরবরাহ হয় সেই টাণ্ড্রার বিশাল বাঁধান হ্রদ দেখতে। মীরার বাবা ও মা কাছাকাছি এক সাধুর সন্ধান পেয়ে দুর্ব্বলতা আর চেপে রাখতে পারেননি। সুব্রত খানিকক্ষণ একলা পড়েছিল। তারপর মীরা এসে যোগ দিয়েছে।

সব কথা সুব্রত এখন মনে করতে পারে না। শুধু এইটুকু মনে আছে সমস্ত ঘটনার পেছনে পটভূমিকা ছিল টাণ্ড্রা ফল্‌সের প্রাকৃতিক দৃশ্য শুধু নয় তার অবিরাম নিরবচ্ছিন্ন গর্জ্জন। সেই গম্ভীর বিরামবিহীন শব্দ কেমন করে যেন সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে দেয়, প্রভাব বিস্তার করে সমস্ত মনের ওপর।

ফল্‌সের ধারে পাকা কয়েকটা ঘর আছে যাত্রীদের বিশ্রাম করবার জন্যে। তারই দোতালার বারান্দায় একটা ইজিচেয়ার মালীকে দিয়ে পাতিয়ে সুব্রত ছিল

বসে। হঠাৎ কাছে একটা ক্ষীণ স্বর শুনে সুব্রত চমকে উঠেছিল। মীরা এসে দাঁড়িয়েছে আলিসার কাছে।

হেসে সুব্রত বলেছিল—"ঝগড়া ছাড়া এখানে আর কিছু শোনা যাবেনা মীরা! তুমি অনায়াসে কোমর বেঁধে লাগতে পার।"

তার নিজের স্বর নিজের কানেই অত্যন্ত ক্ষীণ শুনিয়েছিল। প্রপাতের আওয়াজ আর সমস্ত শব্দ ঢেকে দিয়েছে। মীরাও পায়নি শুনতে ভালো করে; কাছে সরে এসে গলা বাড়িয়ে বলেছিল—"ঝগড়ার কথা কি বলছেন?"

"শুনতে যখন পাওনি তখন আর দরকার নেই।"—তারপর ইজিচেয়ার থেকে উঠে পড়ে বলেছিল—"তুমি বস এইটায়, আমি আরেকটা আনাচ্ছি।"

"থাক আমি বসব না। আপনার সৌজন্যের জন্য ধন্যবাদ! এ জিনিষটা খুব আপনার দুরস্ত।"

"তোমাদের যেটা প্রাপ্য সেটা ত দিতে হবে।"

"আমাদের প্রাপ্য শুধু ওইটুকুই......"

সুব্রত একটু বিস্মিত হয়েছিল বই কি! মীরার কাছে যেন একথা আশা করেনি। এবার ইচ্ছে করেই বলেছিল—"তোমাদের—"তোমাদের প্রাপ্য সসাগরা পৃথিবী কিন্তু আমরা এ যুগের অক্ষম দুর্ব্বল পুরুষ, কতটুকু আর দিতে পারি। সৌজন্য দিয়ে তাই আমাদের দৈন্য ঢাকি।"

মীরা হেসে এবার চেয়ারটায় বসে বলেছিল—"আপনি ঘুমোবার আগে বোধ হয় এসব কথা রোজ তৈরী করে রাখেন—না?"

"না, একটা বই কিনেছি; 'মেয়েদের চমৎকৃত করবার একশ একটি জবাব'—সেইটে মুখস্থ করি। কিছুদিন বাদে হয়ত পুরাণ কথা দুবার বলে ধরা পড়ে যাব।"

এবার দুজনেই হেসে উঠেছিল। মালী তখন আর একটি চেয়ার এনে দিয়েছে। সুব্রত সেটায় না বসে বলেছিল,—"এখনো চেঁচিয়ে কথা বলা ক্ষুর দিয়ে কুটনো কোটার মত, ভাল কথারও ধার থাকেনা। আপত্তি না থাকে ত চল একটু বেরিয়ে পড়ি।"

"আপত্তি ত আপনারই আছে মনে হচ্ছিল।"

"তখন ছিল, ভালো ভালো কথাগুলোর শ্রোতা পাইনি বলে।"

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মীরা বলেছিল—"কোন দিকে যাবেন?"

"সাধুজির আশ্রমে অদৃষ্টটা যাচাই করে আসি চল, তোমার বাবা মা গেছেন।"

"না চলুন এমনি এদিক ওদিক ঘুরে আসি।"

খানিকক্ষণ একসঙ্গে যেতে যেতে দুজনেরই কথা থেমে গিয়েছিল বুঝি প্রপাতের অশ্রান্ত গর্জ্জনের অলক্ষিত প্রভাবে। নিরবচ্ছিন্ন এই শব্দ-নির্ঝরের বুঝি একটা নেশা আছে, ধীরে ধীরে সমস্ত মন অভিভূত হয়ে যায়। কিন্তু সেদিন এমন কিছু উল্লেখ করবার মত ঘটেনি। অন্ততঃ সুব্রতের দিক থেকে নয়। হয়ত জলের একটি ধারা ডিঙোতে গিয়ে সুব্রত মীরার হাত ধরেছে, হয়ত দুধারের পাথরের স্তূপের মাঝখান দিয়ে যেতে দু'জনের ছোঁয়াছুয়ি হয়ে গেছে। কিন্তু সে স্পর্শ সুব্রতের মনে সঞ্চিত হয়ে নেই। সুব্রত সেদিন মীরাকে সামান্য একটু আবিষ্কার করেছিল মাত্র, উৎসাহিত হয়নি।

পিকনিকের পরেও অনেকদিন সুব্রত বিন্ধ্যাচলে ছিল। মীরার প্রতি হয়ত আগের চেয়ে সে বেশী একটু মনোযোগ দিয়েছে, হয়ত কোনদিন অভিনয় করেছে একটু বেশী। কিন্তু তার ভেতর সত্যকার ব্যাকুলতা কিছু ছিলনা। বিন্ধ্যাচলের স্যানাটোরিয়ামের কল্পনার মতই একদিন তার মন থেকে সব মুছে গেছে। মীরার মনে সে সব দিন যে সযত্নে সঞ্চিত থাকতে পারে একথা সে ভাবেনি। আর একবার পাটনায় কিছুদিন আগে মীরার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে, মীরার সঙ্গে ঠিক্ নয়, তার পরিবারের সঙ্গে। তাকে পৃথক করে দেখবার কথা সেদিনও তার মনে হয়নি। মীরার ব্যবহারে হয়ত সে সেদিন ভেবে দেখবার মত কিছু পেত যদি না তার মন থাকত আত্মনিমগ্ন। কিন্তু তার আত্মার ক্লান্তির তখনই সূচনা হয়েছে।

মীরার পরিবর্ত্তন সে লক্ষ্য করেছে একান্ত নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার ভাবে। কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণ পার হয়ে মীরা নারীত্বের পরিপূর্ণতার একটি মহিমা

লাভ করেছে। তবু সুব্রতের কাছে তা ছিল নিরর্থক। মীরা সেদিন বুঝি সমস্ত সঙ্কোচ ত্যাগ করে একটু ধরা দিয়েছিল। আভাস দিয়েছিল তার হৃদয়ের উদ্বেলতার। কিন্তু সুব্রত সচেতন হবার প্রয়োজন বোধ করেনি। সে বিশ্বাসই করেনি। অনুরাগ আকর্ষণের সাধারণ দৈনন্দিন অভিনয় হিসাবে সমস্ত ব্যাপারটাকে গ্রহণ করেছে, মিথ্যা, একটু দুর্ব্বলতার ভান করতেও তার বাধেনি। এই ভানই তার জীবনের মূল পর্য্যন্ত শুকিয়ে দিয়েছে সে জানে, তবু উপায় ত নেই। ভান করাই এসব ক্ষেত্রে রীতি। তুমিও অভিনয়ে যোগ দেবে এইটুকুই সবাই আশা করে। সুবিধা তার অনেক। সময় কাটে বেশ। বিদায়ের বেলা কিছু দাগ থাকেনা মনে; চেনা পাওনা বোঝা পড়ার কোন কোন্ হিসাব নিকাশও নয়। মন যাদের মরে গেছে তাদের পক্ষে এর চেয়ে সুবিধার আর কি হতে পারে। এ অভিনয়ে অভ্যস্ত বলেই তার ক্লান্ত মন মীরার সংস্পর্শে কোন সাড়া দেয়নি।

তারপর এই সাক্ষাত! সুব্রত এতক্ষণে স্পষ্ট করে গতরাত্রের কথা ভাবতে সাহস করে। মীরা তার কাছে শুধু নূতন করে উদ্ঘাটিত হয়নি তাকেও করেছে উন্মোচন, তার নিজের রহস্যকে। শুধু কি নগরের রাত্রির মোহ আর সাক্ষাতের এই আকস্মিকতা তার মনকে বিহ্বল করে তুলেছে এমন করে! তার ভয় হয় সাবানের বুদ্বুদের মত এখনি সমস্ত রহস্য যদি যায় মিশিয়ে, রাত্রির সুর দিনের আলোয় যদি যায় কেটে, যদি রাত্রির সেই রহস্যময় মেয়েটিকে আর না খুঁজে পায় মীরার মধ্যে!

অনেক স্থূল সংস্পর্শ ত হয়েছে তার জীবনে, সে আর তা চায়না, তার মন অবসন্ন এই সমস্ত সংস্পর্শেরই ভারে আর গ্লানিতে, জীবনে তা কিছুই আনে না, শুধু রেখে যায় ক্লান্তির ভার। বিদ্যুৎগর্ভ মেঘে মেঘে সাক্ষাত সে নয়, আকাশ স্পন্দিত হয়ে উঠেনা সে সাক্ষাতের উন্মাদনায়—বিদ্যুতের চেয়ে তীব্র, তার চেয়েও সূক্ষ্ম আনন্দের প্রবাহ বয়ে যায়না সত্তা থেকে সত্তায়।

কাল কি এই সাক্ষাৎই হয়েছিল? না তারই মনের ভুল?

কিন্তু সাহস হয় না তার এ ভুল যাচাই করতে। তার চেয়ে এইখানেই পড়ুক যবনিকা এ অধ্যায়ের ওপর, এই রাত্রির রহস্যকে কাজ নেই দিনের আলো টেনে এনে। জড়ত্বের কুয়াসা ক্ষণিকের জন্য তার মন থেকে গিয়েছে কেটে। এইটুকুই যথেষ্ট আর তার লোভ করবার প্রয়োজন নেই।

নাই বা হল আর মীরার সঙ্গে দেখা। জীবনে সব কাহিনী সম্পূর্ণ হয় না। সম্পূর্ণ করতেই হবে এমন কোন কথা নেই। একটি রাত থাকুক তাদের জীবনে অসম্পূর্ণতায় অপরূপ হয়।

একটি অপরূপ রাত, যাতে তার পতিত আত্মা গম্ভীর জড়ত্ব থেকে জেগে উঠেছে, তার জীবনে অক্ষয় হয়ে থাক।

দীপ তার জীবনে হয়ত জ্বলবে, কিন্তু একটি থাক তারকা, সুদূর দিগন্তে আয়ত্তের অতীত হয়ে।

রাত্রির এই রহস্য-পরিচয় সে প্রাত্যহিক জীবনের মাঝে টেনে এনে ধূলিমলিন করবে না।

সবে এখন সকাল হয়েছে। মানুষের দুর্ব্বলতারও অন্ত নেই জানি, তবু সুব্রতের এই সঙ্কল্পটুকু জেনেই আমরা বিদায় নিলাম।

সিদ্ধকল্প

ধরণীধর গাঙ্গুলীর উচ্চ হাসি বাইরের ঘর থেকেই শোনা গেল। অভ্যাগতদের বাড়ী দেখান শেষ করে তিনি নীচে নেমে আসছেন।

ধরণীধরের আজকাল এ রকম উচ্চহাসি প্রায়ই শোনা যায়। হাসবার অধিকারও তাঁর আছে। জীবনের এমন মধুর পরিপূর্ণ হেমন্তকাল আর ক-জনের ভাগ্যে আসে! না—ভাগ্য বলা চলে না বুঝি ধরণীধরের বেলায়।

একাগ্র সাধনা অনেকেই করে, জীবনে সফলও অবশ্য অনেকে হয়। কিন্তু তবু দৈবের কৃপা অনেকখানি থাকে তাতে। তার মধ্যে আত্মপ্রসাদের খুব বেশী অবকাশ বুঝি নেই। অনেকেরই সাফল্য শুধু বাইরের লোকের চোখে, আদর্শের নাগাল যে মেলেনি, একথা তার নিজের অগোচর থাকে না।

ধরণীধর কিন্তু লাখের মধ্যে এক ব্যতিক্রম। নিজের সৌভাগ্যের বিপুল আয়তন তিনি এই বাড়ীটির মতই নিজের সঙ্কল্প অনুযায়ী গড়ে তুলেছেন; প্রতিপদে নিজের আদর্শের সঙ্গে মাপ মিলিয়ে। প্রতি ধাপে নিজের সঙ্কল্পকে রূপ দিতে দিতে তিনি এগিয়ে এসেছেন। দৈব কোথাও এসে সমস্ত সাজানো ছক উল্টে দেয়নি, বা দিতে পারেনি। তাঁকে কোথাও রফা করতে হয়নি ভাগ্যের সাথে। যেমন করে কুমোর কাদার তালকে শাসন করে নিজের নির্দিষ্ট রূপ দেয়—তেমনি করে ধরণীধর তাঁর সমস্ত জীবনকে নিজের উদ্দেশ্যের দিকে ফিরিয়েছেন, চালিয়েছেন। ওস্তাদ খেলোয়াড়ের মত দাবার আগাগোড়া সব চাল তাঁর বাঁধা। ঘুঁটি কখন এদিক ওদিক হতে পারেনি।

সহজে এতটা বিশ্বাস হয় না? কিন্তু ধরণীধরের জীবন গোড়া থেকে যারা অনুসরণ ক'রে আসছে তাদের অনেকে এখনো সাক্ষ্য দিতে পারবে।

ছোট একটি গলির ভেতর ধরণীধরের সামান্য হ্যাণ্ড-মেশিনের প্রেস যারা দেখেছে তারা অনেকে এখনো বেঁচে। সস্তাদরের 'জবের' কাজ ছাড়া আর কিছু সেখানে হ'ত না। কিন্তু প্রেসটিই ছিল গলির ভেতর, তার মালিকের দৃষ্টি গলি ছাড়িয়ে অনেক সুদূরে ছিল নিবদ্ধ।

তখনই লোকে বলেছে—অত খেটোনা ধরণী, তোমার এই শরীর। সইবেনা—একটা শক্ত অসুখে পড়বে। প্রাণটা ত আগে।

ধরণীধরের শরীর কোনকালে ভালো নয়। রোগা একহারাও তাকে বলা যায় না। যৌবনেই তাঁর চেহারা ছিল বুড়োর মত শুকনো ও শীর্ণ। যৌবন বলতে আমরা যা বুঝি তা কোনদিন তাঁর জীবনে এসেছিল কিনা সন্দেহ।

কিন্তু শুভানুধ্যায়ীদের কথায় ধরণীধর মনে মনে হেসেছেন। শরীর সম্বন্ধে কোন দুর্ভাবনা তাঁর নেই। তিনি তখনই জানতেন খাটুনি তাঁর এই সবে সুরু।

সে প্রেসের পুরান ভাঙা অস্পষ্ট সাইনবোর্ডটা এখনও ধরণীধর গাঙ্গুলীর বিশাল টাইপ্‌ফাউণ্ডারী কারখানার কোন কুঠুরীতে বোধ হয় পাওয়া যাবে। সে সাইনবোর্ডটি সযত্নে ধরণীধর যে রেখে দেননি আবার ফেলেও দেননি নির্মমভাবে, এতে হয়ত তাঁর চরিত্রের খানিকটা পরিচয় পাওয়া যাবে।

ধরণীধর সেই হ্যাণ্ডমেশিনের যুগ থেকে ক্রমশঃ আরো পাকিয়ে আরো শুকিয়ে গিয়েছেন এবং তাঁর ব্যবসা দিন দিন ফেঁপে উঠেছে আশ্চর্যভাবে।

আশ্চর্য হয়েছে অবশ্য আর সকলে, ধরণীধর নিজে নয়। তিনি সমস্ত বন্ধুর পথটা অনেক আগেই ছকে রেখেছেন। সমস্ত চাল তাঁর আগে থাকতে হিসেব করা।

একাগ্র তাঁর সাধনা, অক্লান্ত তাঁর অধ্যবসায়, অসীম তাঁর ধৈর্য কিন্তু তবু জীবনে যাঁরা সিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে ধরণীধরের জীবনকাহিনী লেখায় বোধ হয় কোন উৎসাহ কেউ পাবে না। তার মধ্যে অনিশ্চিতের কোন স্থান

নেই, কোন অবকাশ নেই কল্পনার। জ্যামিতির থিওরেমের মত তা নির্ভুল ভাবে নিয়ন্ত্রিত।

কিন্তু ব্যবসার সাফল্যই ধরণীধরের একমাত্র সৌভাগ্য নয়। তাঁর জীবন অন্য-দিকে দিয়েও পরিপূর্ণ, হেমন্তের এই পড়ন্ত আলোয় যে রকম পরিপূর্ণতা লোকে কামনা করে! ধরণীধর সেই কথা বলতে বলতেই এখন নামছিলেন চওড়া মার্বেল দিয়ে বাঁধান সিঁড়ি দিয়ে। সঙ্গে যাঁরা আছেন তাঁরা কেউ সমব্যবসায়ী কেউ তাঁর বড় খরিদ্দার।

"আমি আর কতটুকু দেখতে পারি! আর শরীরে বয় না!"

ধরণীধর গাঙ্গুলী নিজমুখে তাঁর ক্লান্তি স্বীকার করছেন! সে স্বীকারোক্তিতে আবার আনন্দ!

অরোরা ট্রেডিং-এর প্রশান্ত বাবু একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসেন,—"এখন না দেখেই চলছে বুঝি!"

"না, না, অরুণই দেখে! তা না হলে কি আর পারতাম। শুনলে অবাক হবেন মশাই…"

প্রশান্তবাবুরা কিন্তু জানেন যে অবাক তাঁরা হবেন না, কারণ তাঁরা এ কথা ধরণীধরের মুখে অনেকবার শুনেছেন। ধরণীধরের এই দুর্বলতাটুকু তাঁরা জানেন। তাঁর ছেলে যে এই বয়সে ব্যবসায় বুদ্ধিতে অসাধারণ পাকা হয়ে গেছে; তার দৃষ্টি যে তাঁর চেয়েও তীক্ষ্ণ, সে যে তাঁর এখন ভুল শুধরে দেয়, এবং তিনি যে সমস্ত ব্যাপারে তার মতামতের ওপরই নির্ভর করেন একথা তাঁরা আজ পাঁচ বৎসর, তাঁর ছেলে ব্যবসায়ে যোগ দেওয়া অবধি শুনে আসছেন।

ধরণীধরবাবুর এইটুকু দুর্বলতা, এইটুকুই তাঁর পরম গর্ব! তাঁর বাইরের সমস্ত শুষ্কতার আড়ালে সরস এই একটি কোণ।

বিপুল এই যে ব্যবসায় তিনি গড়ে তুলেছেন তার সার্থকতা তিনি যেন ছেলেটির মধ্যে খুঁজে পান। আত্মপ্রসাদের কোন অবকাশ তিনি জীবনে পাননি, সে উৎসাহও ছিল না। আজ আয়ুর সূর্য যখন পশ্চিমে হেলেছে তখন একটু

নিজেকে প্রশ্রয় দিলে কিছু ক্ষতি নিশ্চয় নেই। আজ নিজের সাফল্য তিনি অরুণের মধ্যে উপভোগ করেন।

রাত্রে যখন সব কাজ শেষ হয়ে যায়, কারখানা নিস্তব্ধ, তাঁর ঘরটিতে ছাড়া আর সব ঘরের বাতি নিভে গেছে, তখন নিজের ঘরের চেয়ারে ঈষৎ হেলান দিয়ে অরুণের জন্য অপেক্ষা করতে কি ভালোই লাগে!

অরুণ নিজের অফিসের সমস্ত খাতাপত্র দেখা শেষ করে ওপরে আসে। চেহারায় বাপের সঙ্গে তার মিল নেই, মায়ের আদলই হয়ত পেয়েছে। তাকে একটু ক্লান্ত দেখায়, একটু অগোছালো।

অরুণকে সব সময়েই একটু ক্লান্ত দেখায়, ধরণীধর তা লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু সেজন্যে খুব দুর্ভাবনা সত্যি তাঁর নেই। ক্লান্তিতে মানুষের ক্ষতি হয় না। ও ক্লান্তি একদিন সয়ে যাবে। তিনিও তখন ক্লান্ত ছিলেন। তাঁর শরীর ত আরো খারাপ। বলতে নেই কিন্তু তাঁর ছেলে তার চেয়ে সুস্থ সবল। তাঁর ধাত সে পায়নি।

অরুণ এসে টেবিলের একধারে বসে। তারপর বাপ ও ছেলের আলাপ চলে,—নিছক ব্যবসায়ের কথা। কিন্তু জীবনে এর চেয়ে আনন্দ ধরণীধর কোনদিন কিছুতে জানেননি। এই তাঁর পরম বিলাস। এই সময়টুকু তাঁর কাছে অমূল্য।

"দশ পয়েন্ট এন্টিক নতুন ডিজাইন এখন আর করাব না।"

ধরণীধর বলেন—"কেন! বদলান দরকার যে! সময়ও আর নেই।"

অরুণ বলে—"কটা দিন দেখাই যাক্ না। বল্লভ কোম্পানীর নতুন সেট দু' দিন বাদেই বাজারে বেরুচ্ছে। সেটা দেখে করানই ভাল।"

ধরণীবাবু খুসী হয়ে একটু হাসেন। তিনি নিজেও তাই ভেবে রেখেছেন। কিন্তু ছেলের মুখ থেকে এই পরামর্শটুকু নিতে তাঁর অপরূপ লাগে।

অরুণ বলে—"বেঙ্গল প্রিন্টার্স-এর অর্ডারটা কিন্তু চেপে রেখেছি।"

এবার হয়ত ধরণীধর সত্যি অবাক হন,—"সে কি! আজই যে দুবার আমাকে ফোন করেছে, অত্যন্ত জরুরী।"

"আগের দুটো বড় অর্ডারের এখনো পেমেণ্ট বাকী।"

"তা থাক না, ওরকম ওদের থাকে। কখনো কিন্তু একটি পয়সার গোলমাল করেনি। তাছাড়া অত বড় খদ্দের আমাদের কটা আছে!"

"কিন্তু পর পর দুটো কাগজে মার খেয়েছে, এখন সেদিন নেই।"

"তা নেই, কিন্তু আবার সেদিন ফিরতে কতক্ষণ! ওরা বনেদি ঘর। ওদের ভিৎ শক্ত।"

অরুণ গম্ভীরভাবে বলে,—"আজ খবর পেলাম ঘোষ ব্রাদার্সের ডায়রীর কন্‌ট্রাক্ট রাখতে পারেনি, সমস্তই গুণাগার। তাছাড়া ভেতরে ভেতরে ম্যানেজমেণ্টের কি সব গলদ নিয়ে ডিরেক্টরদের মধ্যে গণ্ডগোল। শনিবারের মিটিংটা না হওয়া পর্যন্ত তাই চেপে রাখলাম।"

গর্ব, বিস্ময়, প্রশংসা, স্নেহে ধরণীধরের দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।—"হ্যাঁ শনিবার পর্যন্ত দেখা যেতে পারে।"

ধরণীধর তারপর জিজ্ঞাসা করেন—"আজ কালিপদকে দেখিনি, কালও ত আসেনি। আবার অসুখ করল নাকি?"

অরুণ কঠিন মুখে বলে—"না পরশু থেকে আসছেন না। তাঁর জবাব হয়ে গেছে।"

এবার ধরণীধরের মুখেও ঠিক বেদনা না হলেও বিস্ময়ের রেখা বোঝা যায়। খানিকক্ষণ তিনি কোন কথা বলতে পারেন না।

অরুণ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে।

ধরণীধর ধীরে ধীরে বলেন—"কিন্তু…"

"পুরোন লোক জানি, কিন্তু কতদিন এমন ক'রে পোষা যায়। তাঁকে দিয়ে আর কোন কাজ হয় না।"

ধরণীধর একটু সঙ্কুচিত ভাবেই বলেন,—"প্রকাণ্ড সংসার! এক গাদা পুষ্যি। সব তার ওপর নির্ভর। অসুখে পড়েই এমন অকেজো অবস্থা হয়েছে।"

"ফাউণ্ড্রি ত আর হাসপাতাল নয়, অনাথ আতুরের আশ্রমও না।"

ধরণীধরের এবার সামলাতে বুঝি একটু সময় যায়। অরুণ ঠিকই করেছে

সন্দেহ নেই। এসব ব্যাপারে প্রয়োজনের খাতিরে নির্মম না হয়ে উপায় নেই। তিনিও চিরদিন তাই ছিলেন, নইলে এতদূর এগিয়ে আসতে পারতেন না। কিন্তু অরুণ যেন তাঁর চেয়েও বেশী কড়া। তিনি এতটা পারতেন না বোধ হয়। অনেক দিনের লোক। সেই হ্যাণ্ড মেসিনের যুগ থেকে এক সঙ্গে কাজ ক'রে আসছে। তিনি নিজে হাতে গড়ে তুলেছেন। রোগে, শোকে, অভাবে এখন ভেঙে পড়েছে সত্য,—কোন কাজে আর লাগে না, বরং পুরান লোক বলে একটু বেশী আস্কারা নিয়ে সকলের উপর টিকটিক্ করে। তাঁদেরও সব সময়ে মান রাখে না। তাহ'লেও এ চাকরী গেলে একেবারে নিরুপায়···

যাক সে ভাবনা। অরুণ নিজের দায়িত্ব ভালো মতই বোঝে। তার কাছে কোন শৈথিল্যের কোথাও প্রশ্রয় নেই। এই ত দরকার! তাঁর দুর্বলতা আসছে কিন্তু অরুণ কঠিন অটল। ব্যবসার অন্যান্য কথা চলে আরো কিছুক্ষণ। তারপর ধরণীধর ওঠেন। গেটে গাড়ী প্রস্তুত।

অরুণ সঙ্গে সঙ্গে নিচে নেমে আসে। ধরণীধর মোটরে উঠে বলেন—"আয়।"

"আমি একটু পরে যাচ্ছি বাবা!"

ধরণীধর কিছু বলেন না আর; একটু হতাশ হন। ছেলের সঙ্গ তাঁর আরো একটু পেতে ইচ্ছে করে। একসঙ্গে দুজনে খেয়ে রাত্রে যে যার ঘরে না যাওয়া পর্যন্ত তাকে কাছে পেলে তিনি অনেক সুখী হন। অরুণের মা অনেক দিন আগেই গত হয়েছেন। বাপ ও ছেলে ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই। ধরণীধরের একলা এই ভাবে ফিরতে ভালো লাগে না। জীবন এতদিন শুধু কাজে ও চিন্তায় ঠাসা ছিল। তখন নিজেকে কোন দিন নিঃসঙ্গ মনে হয়নি। কোন দিন ফাঁকা ঠেকেনি। আজকাল অরুণ অনেক কেন প্রায় সব দায়িত্ব নেওয়ায় চিন্তার ভিড় অনেকটা হাল্কা হয়ে গেছে। আজকাল তাই ফাঁকা ঠেকে একটু।

কিন্তু অরুণ কিছুদিন হ'ল এক সঙ্গে আর বাড়ি ফেরেনা। ধরণীধর কিছু জিজ্ঞাসা করেন না। তিনি হয়ত জানেন কিম্বা জানেন না,—অরুণ কেন সঙ্গে

আসতে চায় না। কিন্তু অরুণকে সে বিষয়ে কিছু বলতে তাঁর বাধে, আগে কোন দিন বলবার প্রয়োজন হয়নি। আজও তিনি বলবেন না।

ছেলের কথা বলতে বলতে অতিথিদের সঙ্গে প্রকাণ্ড ড্রইংরুমে ধরণীধর এসে উপস্থিত হন। বাড়ীর অন্যান্য ঘরের মত ড্রইংরুমের সাজসজ্জা উপকরণে শুধু ঐশ্বর্য নয়, রুচিরও পরিচয় আছে।

প্রশান্তবাবু ওরই মধ্যে সমঝদার। মনে মনে একটু ঈর্ষা করেন। একটু নাকও সেঁটকান। ধরণীধরবাবুর বাড়ীতে আধুনিক ফার্নিচার, আধুনিক ডেকরেশান! ধরণীধরের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরেই বল্লভ কোম্পানীকে ডুবিয়ে তাঁকে অরোরা ট্রেডিং দাঁড় করাতে হয়েছে। মুখে তারিফ ক'রে বলেন—"বাঃ চমৎকার, চমৎকার ম্যাচ করেছে।"

ধরণীধর পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বলেন, "সব অরুণের পছন্দ মত। ছেলেবেলা ওর বেশ ছবির হাত ছিল যে, চর্চা করলে ভালই হ'ত। কিন্তু সময় কোথায়? আর লাভই বা কি! আমি তেমন উৎসাহ দিইনি। নিজেও ছেড়ে দিয়েছে।"

ধরণীধর অভ্যাগতদের আর একটু ধরে রাখতে চান। এখুনি অরুণ আসবে! তার সঙ্গে দেখা করে না গেলে দুঃখিত হবে। কেন সে দেরী করছে কে জানে, —বিশেষ আজকের দিনে।

আজকের একটু বিশেষ দিন বইকি। এই বিশাল অপূর্ব প্রাসাদ তৈরী শেষ হয়েছে বলে নয় আজ একটি বিষয়ে মন তিনি ঠিক করে ফেলেছেন বলে। আজ তিনি অরুণকে বিস্মিত করতে চান। জীবনে তিনি কোন দিন যা করেন নি, আজ তাই করবেন। নিজের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করবেন অরুণের জন্যে। এই তাঁর প্রথম ও শেষ পরাজয় স্বীকার। কিন্তু এ মধুর পরাজয়—অরুণকে সেই কথা আজ জানাবার দিন।

অরুণ কেন কিছুদিন ধরে অফিসের পর তাঁর সঙ্গে আসে না তিনি জানেন বই কি! প্রাণে তিনি আঘাত পেয়েছেন। এটুকু তিনি আশা করেন নি। অরুণের জীবনে এমন কিছু আসতে পারে তা ছিল তাঁর কল্পনার বাইরে। অরুণ

সঙ্কোচে নিজেকে তাঁর কাছে গোপন করেছে ;—তবু আশা ছিল বেশী দূর এ ব্যাপার গড়াবে না।

তিনি ছেলের সম্বন্ধে মনে মনে অন্য ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। ঐশ্বর্য তিনি প্রচুর সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু আর কিছুর অভাব ছিল। অরুণকে সেই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে যেতে চেয়েছেন। ধরণীধর গাঙ্গুলীর ধারা, সম্মানিত হবে শুধু অর্থের জোরে নয়, সামাজিক মর্যাদার জোরেও, এই তাঁর সঙ্কল্প ছিল।

নয়ানগড়ের রায়েদের বাড়ীর দিকেই তাঁর দৃষ্টি ছিল। তাদের পড়তির দিন। অর্থের ভাণ্ডার শূন্য হয়ে এসেছে। কিন্তু সমাজে এখনো তাদের মাথা সবার উঁচুতে। ছোট তরফের দেবকিশোর রায়কে মাঝে মাঝে ধরণীধরের অফিসঘরে দেখা যায়। লোকে কানাঘুসা করেছে,—ছোট তরফের টিকি পর্যন্ত নাকি •বাঁধা ধরণীধরের কাছে। ধরণীধর কিন্তু স্বীকার করেন না। বলেন,—"বন্ধুত্বের খাতিরে আসে যায়। রায়দের আবার কিসের অভাব।"

সে যাই হোক,—নিজের ইচ্ছাটা দেবকিশোরের কাছে ইঙ্গিতে প্রকাশ করতে তিনি ভোলেন নি, অপর দিক থেকে উৎসাহ না থাক আপত্তিও দেখা যায় নি। সেই দিকেই কথাটা এতদিন এগোচ্ছিল এমন সময় অরুণের এই পরিবর্তন।

ধরণীধর প্রথমে অবশ্য বুঝতে পারেন নি। স্বরেন তাঁরই দূর সম্পর্কের শালা। দুরবস্থায় পড়ে তাঁর কাছে এসেছিল চাকরীর খোঁজে। ধরাধরি করে একদিন অরুণকে নিয়ে গেছে বাড়ীতে। ধরণীধরই সায় দিয়েছেন।

অরুণ রাত্রে বাড়ীতে ফিরে বুঝি খেতে বসতে আর চায়নি। বলেছে,—"কিছুতেই ছাড়লে না বাবা! খেয়ে আসতে হ'ল।"

তারপর হেসে বলেছে,—"অত বেশী যত্ন দেখালে আমি কিন্তু আড়ষ্ট হয়ে যাই। আর কিন্তু লৌকিকতার খাতিরেও যাচ্ছিনা। মেয়েটি কিন্তু রাঁধে ভাল, আমাদের গোবর্ধনের মত নয়!"

ধরণীধর বলেছেন,—"স্বরেনের মেয়ে আছে নাকি? একটি ছেলেই ত জানতাম। তা হবে। সে কত কালের কথা।"

"একটি কেন। দুটি মেয়ে, বড়টি বেশ বড়ই হয়েছে।"

"সেই রাঁধলে বুঝি?" ধরণীধর নেহাৎ কথার কথা হিসাবে জিজ্ঞেস করেছেন।

"আর কে রাঁধবে। মা ত চিররুগ্ন দেখে এলাম। রাঁধুনি রাখার অবস্থাও নয়।"

সেদিন আর কোনও কথা হয় নি। এ বিষয়ে আর কোন কথা ভবিষ্যতে হতে পারে তাও ধরণীধরের মনে হয়নি।

তারপর অরুণ সেখানে মাঝে মাঝে যায় শুনে, তিনি অবাক হয়েছেন। অবাক যাওয়ার দরুণ নয়, তাঁকে সে কথা জানাতে অরুণের সঙ্কোচ দেখে।

.শেষের দিকে সমস্ত ব্যাপার বুঝে তিনি চিন্তিত হয়ে উঠেছেন আরো। তাঁর সঙ্কল্প কি এতদিন বাদে এমনভাবে ব্যর্থ হবে? মনে হয়েছে, স্থরেনকে ডাকিয়ে একবার ধমক দিলে হয়। কিন্তু অরুণের কথা ভেবে নিরস্ত হয়েছেন। অরুণকে সোজাসুজি নিষেধ করা তাঁর নীতি নয়। ছেলেকে সেভাবে তিনি গড়ে তোলেন নি। ভিন্ন পথে গেলেও জানতে পেরে অরুণ হয়ত আঘাত পাবে। তাই ধরণীধর সময়ের হাতে ব্যাপারটা ছেড়ে দিয়েছেন। অপেক্ষা করার ধৈর্য তাঁর আছে।

কিন্তু একদিন হঠাৎ মনে হয়েছে—ধরণীধরের জীবনে সে এক আশ্চর্য দিন —কি দরকার বাধা দেবার? সর্বত্র তিনি নিজের সঙ্কল্পকে খাটিয়ে জয়ী হয়েছেন। অরুণের জীবনের বেলায় কিন্তু কেন বলা যায় না তাঁর দ্বিধা এসেছে একটিবার।

না, দরকার নেই সামাজিক মর্যাদায়। অরুণের জীবনে তাঁর সঙ্কল্প কোন পথ রোধ করে যেন না দাঁড়ায়। অরুণ যদি এতেই স্থখী হয়, হোক!

মেয়েটিকে ইতিমধ্যে তিনি একদিন দেখেছেন। ভালোই লেগেছে। মনে হয়েছে, অন্য ফ্রেমে খাটালে বে-মানান হবে না।

আজ অরুণকে সেই কথা জানিয়ে বিস্মিত করার দিন।

কিন্তু অরুণের দেখা নেই কেন? অভ্যাগতদের আর রাখা যায় না ধরে।

এক এক ক'রে তারা বিদায় নেয়। ধরণীধর একলা বসে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেন। আজ তাঁর দেখা করা চাই।

অরুণ সত্যি অনেক রাত্রে ফিরল। ঘরের উজ্জ্বল আলোয় আজ তাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ধরণীধরের এতদিন বাদে মনে হ'ল—এতটা না খাটলেও তার চলে, দিনকতক কোথাও তাকে পাঠিয়ে দিলে হয়। বিয়েটা হয়ে গেলেই সেই ব্যাবস্থা করবেন। দিনকতক তাকে সম্পূর্ণ ছুটি দিতে হবে।

বললেন—"তোমার বড় দেরী হ'ল। প্রশান্তবাবুদের আমি অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছিলাম।"

অরুণ ক্লান্তভাবে একটা সোফায় এসে বসল। একটু হেসে বললে—, "একটা নতুন খবর আছে বাবা, তোমায় এতদিন বলিনি!"

ধরণীধর একটু মনে মনে হাসলেন। এতদিনে অরুণের সঙ্কোচ তাহলে কাটল।

মুখে ঔৎসুক্য দেখিয়ে বললেন—"কি?"

"বেঙ্গল প্রিণ্টার্সের সমস্ত ভার নিলাম। বিশ বছরের ম্যানেজিং ডাইরেক্টরশিপ। এতদিন ধরে কথাবার্তা আয়োজন চলছিল। ভেতরে ভেতরে সব হিসেব করিয়েছি। লায়বিলিটি এমন কিছু বেশী নয়। আজ সব পাকা হয়ে গেল। মিটিং-এ আজ অবশ্য অনেক বকাবকি করতে হয়েছে।"

ধরণীধর একটু বিমূঢ় ভাবেই অরুণের দিকে চেয়ে রইলেন। কথাগুলো যেন ভালো ক'রে বুঝতে পারেন নি। কি যে তাঁর মনে হচ্ছে তাও তিনি ঠিক ধরতে পারছেন না।

তবু বেঙ্গল প্রিণ্টার্স সম্বন্ধে আরো খানিকক্ষণ কথা চল্‌ল। ধরণীধরের এই প্রথম সে কথায় বিশেষ উৎসাহ নেই। এক সময়ে নিজের বক্তব্যটা সুযোগ মত পাড়লেন।

"ভাবছি সুরেনকে আমাদের পুরান বাড়ীটায় উঠে আসতে বলব।

"সুরেন?—ওঃ! কিন্তু আমাদের বাড়ীতে কেন?"

ধরণীধর একটু হাসলেন,—"নইলে কি ভালো দেখায়। কোন এঁদো গলির একটা ভাঙা বাড়ীতে থাকে।"

অরুণের মুখ দেখে মনে হয় সে বুঝি সত্যিই অবাক হয়েছে,—"কিন্তু বরাবরই ত তাই আছে। ভালো বাড়ীতে থাকবার অবস্থা ত নয়।"

না, অরুণ তাঁকে স্পষ্ট করে না বলিয়ে ছাড়বে না। এখনো সে ধরা দিতে রাজি নয়। ধরণীধর আবার হেসে বললেন,—"অবস্থা নয় বলেই ত আমাদের ব্যবস্থা করতে হবে! ও বাড়ী থেকে কি কাজ হতে পারে!"

একটু থেমে অরুণের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "ওর বড় মেয়েটির সঙ্গেই তোর সম্বন্ধ ঠিক করছি। মেয়েটি ভালো!"

অরুণের মুখ কি চকিতে একবার দীপ্ত হয়ে উঠল! কিন্তু সে দীপ্তি ক্ষণিক। অরুণ ক্লান্ত মুখে চুপ করে খানিকক্ষণ বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে দৃঢ়স্বরে বলে,—"সে ত হয় না বাবা!"

"কেন, কেন?" ধরণীধরই বুঝি একটু উত্তেজিত।

"অনেকটা তফাৎ বাবা। অবস্থার গরমিলটা তুচ্ছ করবার জিনিস নয়!" অরুণের স্বর কঠিন!

"ওসব কিছু নয়, আমি যখন মত দিচ্ছি..."

অরুণ উঠে পড়ল—"আমি ভেবে দেখছি বাবা, সে ভালো হয় না!"

দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় অরুণ একবার ফিরে, হেসে বলে গেল,—"নয়ানগড়ের দেবকিশোরবাবুর সঙ্গে আজ দেখা হ'ল। মিটিং-এ উনিও ছিলেন। কটা শেয়ার বুঝি আছে।"

ধরণীধর খোলা দরজার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে বসে রইলেন। তাঁর সত্যিকার খুসী হওয়া উচিত।

অত্যন্ত খুসী হওয়া উচিত নয় কি!

যাত্রাপথ

ঝাঁঝার পরেই গাড়ী একেবারে খালি হইয়া গেল। এতটা সুবিধা যে হইবে তাহারা আশা করে নাই।

এতক্ষণ পর্যন্ত যে ভীড়ের মধ্যে তাহাদের কাটিয়াছে! কথা কওয়া দূরের কথা, পাশাপাশি দুজনে বসিতেও পায় নাই।

গাড়ীতে তিল ধরণের জায়গা ছিল না, নিজেদের মধ্যেই বন্দোবস্ত করিয়া মেয়েদের তাই একদিকের একটা বেঞ্চি ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, পুরুষেরা বাকী বেঞ্চিগুলি ও সুটকেশ ট্রাঙ্কের উপর যেখানে যেমন সুবিধা বসিয়াছিলেন।

মধুপুর হইতেই গাড়ী খালি হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। ঝাঁঝায় তাহাদের দুইজন বাদে আর সকলেই মোট ঘাট সমেত নামিয়া গেলেন। নতুন কেহ সেখানে হইতে গাড়ী ছাড়া পর্যন্ত ওঠে নাই। সুতরাং পরের স্টেশন পর্যন্ত এবং ভাগ্য ভালো হইলে আরো বহুদূর তাহারা একেবারে নির্ঝঞ্ঝাটে যাইতে পারিবে।

গাড়ী ঝাঁঝা হইতে ছাড়িতেই, মলিনা মাথার ঘোমটা সরাইয়া মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল।

অজয় এই হাসিটুকুরই প্রত্যাশা করিতেছিল। বলিল—"এধারে এসো।"

ওধারে যাইতে মলিনার আপত্তি দূরের কথা ব্যগ্রতাই আছে। ঝাঁঝায় গাড়ী ছাড়িবামাত্র সে ভাবিতেছে অজয় তাহাকে কখন ডাকিবে। কিন্তু একটু লজ্জা হয় না কি!

সে মাথা নীচু করিয়া একটু হাসিয়া বলিল,—"ওধারে কেন ?"

অজয় গম্ভীর হইবার ভান করিয়া বলিল,—"গাড়ীর এ ধারেই বসতে হয়।"

মলিনা হাসিয়া ফেলিল,—"কই গাড়ীতে ত লেখা নেই !"

"সব কথা কি লেখা থাকে। বুঝে নিতে হয়।"

"বা রে তুমি এ ধারে আসতে পারনা বুঝি !" মুখে বলিলেও মলিনা কিন্তু উঠিয়া আসিতে দেরী করিল না।

গাড়ীতে জায়গা প্রচুর, কিন্তু তাহাদের বসিবার ধরণ দেখিয়া তাহা মনে হয় না। দুজনে ঘেঁসাঘেঁসি হইয়া বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছে! খোলা জানালা দিয়া শীতের দুপুরের ঈষৎ উষ্ণ মধুর হাওয়া ঝড়ের মত ট্রেণের কামরায় ঢুকিয়া মলিনাকে একটু ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। গায়ের কাপড় সামলাইয়া বসিতে মাথার চুলগুলি উড়িয়া উড়িয়া মুখে পড়ে, মুখের চুলগুলি ঠিক করিতে গেলে আঁচল উড়িয়া আসিয়া মুখে চাপা দিয়া দেয়।

মলিনার দুরবস্থা দেখিয়া নিজেই তাহার চুলগুলা সরাইয়া দিয়া অজয় বলিল,—"জানালা বন্ধ করে দেব ?"

"ওমা, তাহলে কি দেখব ! গাড়ী চড়ে যদি বাইরের কিছু দেখতে পেলাম না, তবে লাভ !"

"ভেতরে দেখবার কিছু নেই ? কেন, এর মধ্যেই আমাতে অরুচি হয়ে গেছে ?"

"খুব কথা ঘুরোতে পার !"

"তবু মুখটা ঘোরাতে পারলাম না ত !"

"বা-বাঃ এই ঘুরিয়েছি, হয়েছে ! তোমার দেখতে ইচ্ছে করে না ?"

"কি দেখব বাইরে ?"

"কেন, কি সুন্দর বন জঙ্গল, মাঠ, চাষীদের বাড়ী ! আমার কিন্তু ওই রকম বাড়ীতে থাকতে বড় ইচ্ছে করে !"

"ও ইচ্ছেটা, ট্রেণের এই কামরাটা বোধ হয় তৈরী হওয়া অবধি প্রতিদিন শুনে আসছে !"

"তার মানে ?"

"তার মানে সবাই একদিন ট্রেণে চড়ে ও কথা বলে !"

"তা আমিও না হয় বললাম, আমি ত আর অসাধারণ কেউ নই যে শুধু নতুন কথা বলব !"

"কিন্তু যা বল তাই যে নতুন লাগে।"

"খুব হয়েছে ; থাক !"

"কিছুই হয়নি এখনো, আচ্ছা এই রকম একটা কামরা বরাবর একলা পে'লে কি রকম মজা হত !"

মলিনা বলিল,—"বাবা, সে কত টাকা !"

"হোক না কত টাকা ! কিন্তু কি সুন্দর হয় !"

"অত টাকা খরচ তা বলে !"

অজয় হাসিয়া ফেলিল—"তুমি কি ভাবছ আমি এক্ষুনি রিজার্ভ করতে যাচ্ছি !"

না, মলিনা তা মোটেই ভাবে নাই। কথাটা একরকম নিজের অজ্ঞাতে অজয়কে খুশী করিবার জন্যই সে বলিয়াছে। অজয় যে অমন একটা বেহিসাবী কাজ করিয়া বসিতে পারে সেরকম ধারণা করিবার মত কিছু সে পায় নাই। বরং এ বিষয়ে সামান্য—এখনও অতি সামান্য—কেমন একটু খোঁচ তাহার মনে আছে ! হাওড়া স্টেশনে উঠিবার সময় কুলির ব্যাপারটা তাহার ভাল লাগে নাই। সামান্য দুইটা পয়সা লইয়া অতখানি হৈ চৈ, অমন ঝগড়াঝাটি, কেলেঙ্কারী ;—হ্যাঁ একটু কেলেঙ্কারীই বই কি, তাহার স্বামী যে করিতে পারে এ যেন সে কল্পনাই করিতে পারে না। ব্যাপারটা তাহার ভাল লাগে নাই। কিছুই সেটা নয়, এই বলিয়া অবশ্য সে সেটা উড়াইয়া দিয়াছে। কিন্তু একেবারে ভুলিতে পারিয়াছে কি !

কুলিটাকে দাঁত খিচাইয়া উঠিবার সময় তাহার স্বামীর মুখের সেই অপ্রত্যাশিত বিকৃতি, সেটুকু—সে মনে করিয়া রাখিতে সত্যই চায় না। আশ্চর্যের বিষয় সে মুখ মনে পড়িলে কেমন যেন অহেতুক তাহার একটা ভয় হয়। এটা তাহার অবশ্য নেহাৎ ছেলেমানুষী।

কিন্তু সত্যই কুলিটাকে দুইটা পয়সা দিলে কি ক্ষতি ছিল! গোড়ায় কথা দিয়া শেষে অমন কম দিলে সে ত গোলমাল করিবেই!

সামান্য একটু ব্যাপার এমন করিয়া মনে রাখা তাহারই নিশ্চয় অন্যায়, কিন্তু তখন কামরা শুদ্ধ লোকের মধ্যে তাহার কি লজ্জাই করিয়াছিল।

বিশেষ করিয়া এমন একটা দিনে অমন ব্যাপার না ঘটিলেই হইত না কি! বিবাহ হইয়াছে তাহাদের মাস ছয়েক। কিন্তু বিবাহের পরই বাবার অসুখের জন্য তাহাকে বাপের বাড়ী থাকিতে হইয়াছে এবং অজয় তাহার চাকরীস্থল পাটনা ছাড়িয়া একবারের বেশী দেখা করিতে আসিতে পারে নাই। সুতরাং তাহারা পরস্পরের কাছে একেবারে নূতন বলিলেই হয়। এই প্রথম সে শুধু যে স্বামীর সঙ্গে তাহার কর্মস্থলে যাইতেছে তাহা নয়, এতখানি একত্র থাকিবার সুযোগও সে এই প্রথম পাইয়াছে।

এ যাঁওয়ার অপূর্বতা ওই ছোট ঘটনায় কেমন যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

তাহার স্বামী যে একটু হিসাবী, এটুকু অবশ্য মলিনা এইটুকু পথের মধ্যেই না বুঝিয়া পারে নাই। সে নিজে অন্য রকম আবহাওয়ায় মানুষ। তাহার বাবা এক জীবনের মধ্যে বহু পুরুষের অর্জিত বিশাল সম্পত্তি সদ্ব্যয়ে ও অপব্যয়ে উড়াইয়া দিয়া প্রায় ফতুর হইয়া আসিয়াছেন। তাহাদের বাড়ীতে অর্থের মূল্য সে অন্যভাবে বুঝিতেই শিখিয়াছে। তাই অজয়ের ছোট খাট আচরণ তাহার কাছে বুঝি কেমন অদ্ভুত ঠেকে।

পানওয়ালার কাছে একটা অচল দোয়ানি চালাইয়া তাহার সেই অদম্য উল্লাস একটু অস্বাভাবিক নয় কি! মলিনা সত্যই বিস্মিত না হইয়া পারে নাই।

বর্ধমান হইতেই ভীড় সুরু হইয়াছিল তাহার আগে তাহারা একদিকেই বসিয়াছিল, দু'চারটা কথা বলিবারও সুযোগ তখন ছিল।

মেমারী হইতে একদল সাঁওতাল কুলি মজুর না জানিয়া শুনিয়া তাহাদের ইণ্টার ক্লাশে উঠিয়া পড়ে। গাড়ী তখন ছাড়ে ছাড়ে। তাহাদের কাকুতি মিনতিতে কেহ আর তাহাদের নামাইয়া দিতে পারে নাই। মেঝের উপরই তাহারা সকলে মিলিয়া কোন রকমে বসিয়াছে।

বর্ধমানে তাহারা নামিয়া যাইবার আগে মলিনা অজয়কে একবার চুপি চুপি বলিয়াছে, "দেখ ওই সাঁওতাল মেয়ে দুটো আমাদের দেখিয়ে কি বলাবলি করছে ?"

"তোমায় দেখে অবাক হয়েছে বোধ হয় !"

"আহা আমায় দেখে হবে কেন ? তোমায় দেখে হয়েছে ! ভাবছে বোধহয় এমন স্থন্দর লোকের এমন প্যাঁচার মত বৌ ।"

"ইস্ খুব যে ঠাট্টা শিখেছ !"

কিন্তু মলিনা ঠাট্টা ঠিক করে নাই। মলিনা কুৎসিত অবশ্য নয়, কিন্তু অজয় সত্যই স্থপুরুষ। দশজনের মধ্যে দাঁড়াইলে তাহাকে আলাদা করিয়া দেখিতেই হয়। তাহার কাছে মলিনা নিতান্ত সাধারণ !

মলিনার মনে সেজন্য যদি একটু গর্ব থাকে তাহা হইলে দোষের কিছু নয়, নিশ্চয়।

এমন স্থন্দর মুখ হাওড়া স্টেশনে সেই কুলির ব্যাপাবে কি করিয়া অমন কুৎসিত দেখাইয়াছিল কে জানে ! তাহার মনে সেই দৃশ্য যেন কাঁটার মতই বিঁধিয়া আছে দেখা যাইতেছে।

বর্ধমান স্টেশনে গাড়ি থামিতে সাঁওতাল কুলীরা নামিয়া গিয়াছিল কিন্তু গাড়ি আবার ভর্তি হইয়া গিয়াছিল নূতন যাত্রীর ভীড়ে।

ভারি একটা মজার ব্যাপার হইয়াছিল সে স্টেশনে। ঠিক মজার বুঝি বলা চলে না, কারণ সেই প্রথম অজয় তাহার উপর রাগ করিয়াছে—সত্যকার রাগ।

মলিনা যে ধারে মেয়েদের সঙ্গে বসিয়া আছে সেই ধারেই স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম। গাড়ী ছাড়িবার কিছু আগে অজয় বলিযাছে,—"কিছু মিহিদানা সীতাভোগ নিলে হয় না ?" তাহার পর নিজেই বলিয়াছে—"থাক গে, যত পচা জিনিষ !"

কিন্তু খানিক বাদে তাহার কি খেয়াল হইয়াছে,—"বেশী নয় আনা চারকের নেওয়া যাক ! দুজনের ওই যথেষ্ট—কি বলো।"

গাড়ীর এত লোকের মাঝে বসিয়া মলিনা আর কথা বলিতে পারে নাই, ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়াছে।

অন্যান্য জানলায় অপরাপর যাত্রীরা তখন নিজেদের সওদা করিতে ব্যস্ত। মলিনার পাশের জানালা হইতেই ফেরীওয়ালাকে ডাকার পর, অজয় তাহার হাতে একটা সিকি বাহির করিয়া দিয়াছে।

বিভ্রাট হইয়াছে তাহার পর। অজয়ের অসুবিধা দেখিয়া মলিনা নিজেই হাত বাড়াইয়া ফেরীওয়ালার দেওয়া ঠোঙাটি গ্রহণ করিতে গিয়াছে। সেইটুকুই তাহার বোকামি। ধরিবার দোষে ঠোঙ্গাটা আর ভিতরে পৌছায় নাই, প্ল্যাটফর্মে পড়িয়া গিয়া সমস্ত খাবার ছড়াইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

মলিনা এমনিই লজ্জায় এতটুকু হইয়া গিয়াছিল ; কিন্তু সহসা স্বামীর অতটা তিক্ত কণ্ঠ সে আশা করে নাই।

"ফেললে ত। আশ্চর্য!"

কথাগুলি নয়, গলার স্বর ও মুখের অস্বাভাবিক কাঠিন্যই মলিনাকে বিমূঢ় করিয়াছে। অজয় সত্যই রাগ করিয়াছে। চেষ্টা করিয়াও সে রাগ অজয় যে গোপন করিতে পারিতেছে না তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়।

"গেল চার আনা পয়সা জলাঞ্জলি! একটু ভাল ক'রে ধরতে হয় না!" গাড়ীর অন্যান্য অনেকে বরং সহানুভূতির স্বরে বলিয়াছে,—"হাত ফসকে অমন যায় মশাই। আফশোষ করে আর কি হবে। ও আবার কিনে নিন।"

অজয় বিরক্ত মুখে কিন্তু শুধু ফেরিওয়ালাকেই খানিকক্ষণ অসাবধানতার জন্য বকাবকি করিয়াছে, কিনিবার আর নাম করে নাই।

এসব ছোট খাট ব্যাপারকে আমল দেওয়া উচিত নয়। মলিনা ইহাতে পাছে স্বামীকে সামান্য একটু ছোট ভাবিতে হয় সেইজন্য নিজের উপরই রাগ করিয়াছে। দোষ তাহার নিজেরই। তাহার বাপের বাড়ীর সংসারে সব কিছুই আলগা, সেখানে সে কোন বিষয়েই সাবধানী হইতে শেখে নাই। নূতন করিয়া নিজেকে তাহাকে গড়িতে হইবে এবার। তাছাড়া এসব তুচ্ছ জিনিস ধর্তব্যই নয়, যেখানে তাহাদের সত্যকার আনন্দ-লোক সেখানে ত ইহার স্থানই নাই।

মলিনা এই সব কথা ভাবিতেই বুঝি একটু অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল, অজয় এবার তাহাকে নাড়া দিয়া বলিয়াছে—"কি ভাবছ?"

মলিনা হাসিয়া বলিয়াছে—"কিচ্ছু না।"

"বাঃ কতক্ষণ চুপ করে আছ জান? বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে না ত?"

"তা করতে নেই?"

"নেই কেন। কিন্তু আমাকে কি একেবারে ভুলে যেতে হয়।"

মলিনা হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়ায় বলিয়া ফেলিয়াছে,—"আমি ভুলব কেন। তুমিই বরং মাঝে ভুলে গেছলে।"

"কখন আবার?"

এমনভাবে কথাটা বলিবার মলিনার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু যখন মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, বলিয়া ফেলাই ভাল।

"আহা মনে নেই যেন। ঝাঁঝায় যারা নেমে গেল গো। তোমার দিকে থেকে থেকে চাইছিল। নামবার সময়ও পিছু ফিরে ফিরে তাকাল। তুমিও ত চাইছিলে—আমি যেন দেখিনি।"

অজয় হাসিয়া উঠিয়াছে।

মলিনা আবার বলিয়াছে—"বেশ সুন্দরী কিন্তু। তোমার সঙ্গে মানাত। তবে ভারী বেহায়া বাপু।"

অজয় হাসিয়া বলিয়াছে,—"বেহায়া বলছ কেন?"

"ইস্ বড্ড বাজল যে! আলাপ হয়েছে নাকি?"

অজয় হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিয়াছে,—"আলাপ। হ্যাঁ আলাপ ত ছিল।" তাহার পর একটু থামিয়া বলিয়াছে,—"আর একটু হলে ওর সঙ্গে বিয়ে হয়ে যেত যে।"

মলিনা উৎসুক হইয়া বলিয়াছে—"ওমা, সেকি! তবে কথা কইলে না যে?"

অজয় তেমনি গম্ভীর ভাবে বলিয়াছে—"কথা আর কি কওয়া যায়!"

মলিনার মুখ বুঝি একটু ম্লান, তবু উৎসুকভাবে সে বলিয়াছে,—"কি হয়েছিল, বল না গো।"

"সে বলতে কি ভাল লাগে! বিশেষ তোমার কাছে কি উচিত?"

"না না, খুব উচিত; তুমি বলো।"

অজয় সুরু করিয়াছে, "তখন কলকাতাতেই থাকি। আমার সঙ্গে সেখানেই আলাপ। আমাদের বাড়ীর পাশেই থাকত। মস্ত বড় লোকের একটিমাত্র মেয়ে, বাপের অগাধ সম্পত্তি…"

"সে রকম ত সাজ পোষাক নয়, ইণ্টার ক্লাশে যাচ্ছে।"

"ওইরকম স্বভাব। এখন আরো ওইরকম হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে আলাপ ভারি অদ্ভুত ভাবে।"

অজয় দীর্ঘ একটা কাহিনী বলিয়া চলিল। সে কাহিনীর শেষ দিকে অজয় নিজেই যেন উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে মনে হইল।

আমি বল্লাম, "তা হয় না লতা। তুমি অনেক সুখে মানুষ হয়েছ, আমার সঙ্গে অত কষ্ট করতে পারবে না। বিশেষ তোমার বাবার যখন অমত।"

লতা বল্লে,—"বাবার অমত বিয়ে হয়ে গেলে আর থাকবে না। তুমি এত ভীরু?

বল্লাম—"আমি ভীরু নই, লতা; কিন্তু তোমার বাবা মনে করবেন, তাঁর সম্পত্তির লোভে আমি তাঁর একমাত্র মেয়েকে ভুলিয়ে নিচ্ছি এ আমি সহ্য করতে পারব না। তুমি যদি গরিবের মেয়ে হতে…"

লতা আমায় বাধা দিয়ে বল্লে,—"বেশ বাবার কোন কিছু আমরা স্পর্শ করব না।"

"তবু এ হয় না লতা। তুমি আমার জন্যে কষ্ট সহ্য করতে রাজী হতে পার, কিন্তু তোমায় তেমন করে রাখতে আমার পৌরুষে বাধবে। আমার যদি শুধু কিছু সম্বল থাকত! তোমার নিজেরও যদি থাকত!"

"আমায় কষ্টে রাখতে তোমায় হবে না। তুমি দাঁড়াও।"—বলে লতা ওপরে উঠে গেল।

"তারপর কি করলে জান? ফিরে এসে একটি বাক্স আমার হাতে দিলে। রূপোর কাজ করা বেশ বড় বাক্স। কি ভারী সে!"

"এ কি হবে লতা?"—জিজ্ঞাসা করলাম।

বল্লে,—"এ আমার মার গয়না। আমায় দিয়ে গেছেন—এ আমার নিজের সম্পত্তি। এতে আমার বাবার এতটুকু অধিকার নেই।"

অবাক হয়ে বল্লাম—"এ-ত আমি নিতে পারব না লতা। তুমি পাগল হয়েছ ?"

"পাগল হইনি, তবে হ'ব। তুমি যদি রাজী না হও, ত এক্ষুনি আমি চীৎকার করব। বলব, তুমি লুকিয়ে এটা নিয়ে পালাচ্ছিলে।"

আমি হতভম্ব হয়েও হাসলাম একটু। তারপর চট্‌ করে মাথায় একটা বুদ্ধি খুলে গেলো।

বল্লাম—"আচ্ছা তাই হবে। কিন্তু এমন ভাবে ত যাওয়া যায় না। তুমি এইখানে এটা নিয়ে দাঁড়াও আমি গাড়ী ডেকে নিয়ে আসি।"

লতা হেসে বল্লে—"কিন্তু দেরী কোরোনা, আমায় এ অবস্থায় চাকরবাকর দেখলে কি ভাববে !"

"এক্ষুনি আসছি"—বলে বেরিয়ে এলাম।

আর ফিরিনি তারপর।—

অজয় চুপ করিয়া উত্তেজিতভাবে মলিনার দিকে তাকাইল।

মলিনা তখন ক্লান্ত ম্লানমুখে বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে।

না, কোন ঈর্ষার বেদনায় নয়। গল্প যে বানানো তাহা সে আরম্ভ হইতে না হইতেই বুঝিয়াছে। কোথায় সে নিদারুণভাবে যে আঘাত পাইয়াছে তাহা সে নিজেও বুঝাইতে পারিবে না, কিন্তু হঠাৎ তাহার সমস্ত জীবন যেন শূন্য হইয়া গিয়াছে। ট্রেণের এই কামরা যেন বদ্ধ কারাগার। নিশ্বাস লইবার জন্য তাহাকে মুখটা বাহিরে না বাহির করিলে চলিতেছে না।

অজয়ের মনে তখনও বুঝি তাহার নিজের গল্পের নেশা লাগিয়া আছে। সহসা মলিনার দিকে চাহিয়া তাহার মনটা কেমন খারাপ হইয়া গেল। মনে হইল, এই নিতান্ত সাধারণ মেয়েটিকে চিরজীবনের বোঝারূপে বহন করায় কোন উন্মাদনাই নাই।

সহযাত্রিনী

চলিয়াছি ইণ্টার ক্লাশে। একে গ্রীষ্মকাল তাহাতে কি একটা পর্ব উপলক্ষ্যে রেলের ভাড়া দেড়ার নীচে বেশ খানিকটা নামিয়াছে। সুতরাং গরমের সঙ্গে অসম্ভব রূপ ভীড় হওয়ায় প্রাণান্ত হইবার উপক্রম হইতেছিল।

মানুষ শুনি সামাজিক জীব, মানুষের সঙ্গ না হইলে তাহার নাকি চলে না। কিন্তু তখন মানুষের সঙ্গ লাভের জন্য তেমন কিছু ব্যাকুলতা বোধ করিতেছিলাম না, মনুষ্য-সমাজ সম্বন্ধে তেমন কোন আগ্রহও নয়। বরং মনে হইতেছিল ধরণীর ভার বড় বেশী হইয়া পড়িয়াছে তাই একটা উপায় দরকার।

ঘর্মাক্ত কলেবরে খবরের কাগজখানিকে হাত-পাখা করিয়া গাড়ীর উষ্ণ বায়ুকে সঞ্চালিত করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে যখন সমস্ত মনুষ্যসমাজের বিলোপ সম্বন্ধে এমনি অসামাজিক অভিলাষ পোষণ করিতেছি তখন গৃহিণী কিন্তু অবিচলিত ভাবে পার্শ্ববর্তিনীর সহিত নাতিমৃদু-কণ্ঠে বেশ আলাপ জুড়িয়া দিয়াছেন।

গৃহিণী কথা কহিতে একটু বেশী ভালবাসেন। পনেরো বৎসর ধরিয়া সাহচর্য করিয়া সে কথা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছি। প্রথম ফুলশয্যার রাত্রি হইতে তাঁহার বাক্য-সুধাবর্ষণের বিরাম কোন দিন হয় নাই। আমার উত্তর দিবার অপেক্ষা না করিয়া পনেরো বৎসর তিনি একাই অবিশ্রান্তভাবে আমাদের আলাপ আলোচনা চালাইয়া আসিয়াছেন। আমাকে সামান্য হুঁ হাঁ দিয়া কমা সেমিকোলনগুলি যোগাইতে হইয়াছে মাত্র। ভাবিয়াছিলাম বয়সের সঙ্গে বাক্যের এ অমিতব্যয়ের ফল ফলিবে, কথার ভাণ্ডার তাঁহার ফুরাইবে। এখনও পর্যন্ত তাহার কোন লক্ষণ কিন্তু দেখা যায় নাই। যাক্ সে ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্যের আলোচনা আর করিব না।

আপাততঃ এই অসহ্য অবস্থাতেও তাঁহার বাক্যালাপের উৎসাহ আছে দেখিয়া বিস্মিত হইতেছিলাম।

পার্শ্ববর্তিনীকে দেখি নাই, দেখিবার উপায়ও ছিল না। এই দারুণ গ্রীষ্মের মাঝে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া তিনি যে ভাবে আত্মগোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার পরিচয় লইবার কোন উপায়ও ছিল না। পনেরো বৎসর ধরিয়া আমি যাহা সহ্য করিয়া আসিতেছি তিনি দুই ঘণ্টা ধরিয়া কিরূপ উপভোগ করিতেছেন, জানিবার কৌতূহল যে একটু হইতেছিল না এমন নয়।

আলাপ অবশ্য একতরফাই হইতেছিল। গৃহিণীর সেটুকু দয়ামায়া আছে, অপরের নীরবতা, তিনি নিজের কথাতেই পূরণ করিয়া লন। তবু অপরিচিতার দুরবস্থা অনুমান করিয়া একবার গৃহিণীকে থামাইবার চেষ্টা করিলাম। বলিলাম,—"এত বেটা ছেলের ভীড়ে কি বক্‌বক্ করছ বলত? লজ্জা করে না?"

আধুনিক শিক্ষার আলোক হইতে বঞ্চিতা, শৃঙ্খলিত ভারত রমণী ঘোমটার ভিতর হইতে ধমক দিয়া বলিলেন—"বেটা ছেলে ত হয়েছে কি? তাদের সঙ্গে ত কথা কইতে যাইনি।"

অগত্যা চুপ করিয়া গেলাম। কিন্তু বিপদ এবার বাড়িল। অপরের উপর যতক্ষণ অত্যাচার চলিতেছিল ততক্ষণ মনে মনে প্রচুর সহানুভূতি জানাইয়াছিলাম। এবার কিন্তু নিজের উপর উৎপীড়নের উপক্রম হইল এবং দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল ইহার চাইতে আগের ব্যবস্থাই ভাল ছিল।

কুনুইয়ের গুঁতা দিয়া মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া গৃহিণী চুপি চুপি স্পষ্ট স্বরে বলিলেন,—"এই মেয়েটির পাশে যে লোকটি বসে আছে তাকে একটু ভাল করে লক্ষ্য করে দেখ দিকি।"

সামান্য একটু প্রতিশোধের সুযোগ অবহেলা না করিতে পারিয়া বলিলাম—"তোমাদের পছন্দই আলাদা। লক্ষ্য করবার মত সুপুরুষ ব'লে ত মনে হচ্ছে না।"

গায়ে সজোরে চিমটি কাটিয়া গৃহিণী বলিলেন,—"আহা কথার কি ছিরি! আমি কি সুপুরুষ বলে দেখতে বল্লাম। লোকটাকে বদমায়েস ব'লে মনে হচ্ছে না?"

বলিলাম,—"বদমায়েস-তত্ত্ব সম্বন্ধেও তোমার চেয়ে জ্ঞান আমার অল্প স্বীকার

করতেই হবে। স্কুল কলেজে যা কিছু শিখেছি তার মধ্যে মুখ দেখে বদমায়েস চেনবার কোন বিদ্যা ছিল না।"

"খুব বক্তৃতাবাগীশ হয়েছ!" বলিয়া বিরক্ত হইয়া স্ত্রী তখনকার মত আমায় রেহাই দিয়া আবার পার্শ্ববর্তিনীর প্রতি মনোনিবেশ করিলেন।

কিছুক্ষণ বাদে একটি স্টেশনে গাড়ী থামিলে স্ত্রীর তথাকথিত বদমায়েস লোকটি গাড়ী হইতে নামিয়া এক ঠোঙ্গা খাবার কিনিয়া মেয়েটির হাতে দিল, দেখিলাম।

খাবার খাইয়া মুখ ধুইবার জন্য অন্য দিকের জানলায় তাহারা সরিয়া যাওয়া মাত্র সজোরে হাত ধরিয়া টানিয়া স্ত্রী চুপি চুপি যাহা বলিলেন তাহা গাড়ীর অপর প্রান্ত পর্যন্ত শোনা যায়।

"ওগো এইবার ঠিক হয়েছে।"

তাঁহার আকস্মিক ব্যস্ততায় ভীত ও বিস্মিত হইয়া উঠিলাম। কি হইয়াছে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম,—"কি ঠিক হয়েছে?"

আমার মূর্খতায় বিরক্ত হইয়া গৃহিণী আরো ব্যস্ততা সহকারে বলিলেন,—"মেয়েটা ও লোকটার বউ নয়।"

এবার হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম,—"লোকটাও হলফ্ করে সে কথা ত কখনও বলেনি। গাড়ীতে বউ ছাড়া অন্য আত্মীয়কে সঙ্গে নিয়ে যাবার বিরুদ্ধে কোন আইনও নেই।"

আমার বুদ্ধির স্থূলতায় বোধহয় হতাশ হইয়া গৃহিণী মৃদুকণ্ঠের ভান করিয়া বলিলেন—"বদমায়েস লোকটা মেয়েটাকে নিয়ে পালাচ্ছে।"

আশপাশের সকলে তখন আমাদের কথা উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিতেছে। স্ত্রীর এই কল্পনাতিশয্যে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলাম,—"কি যা তা বলছ। পাগল হয়েছ নাকি! ওরা শুনতে পেলে কি মনে করবে!"

আমার পাশে যে স্থূলকায় ভদ্রলোকটি কোমরের উপর হইতে সমস্ত দেহ অনাবৃত করিয়া গরমে হাঁস ফাঁস করিতেছিলেন, তিনি হঠাৎ অযাচিত ভাবে আলোচনায় যোগ দিয়া বলিলেন,—"না মশায় ব্যাপারটা শুনুনই না। ওরা যখন আসানসোলে গাড়ীতে উঠল তখনই আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল।"

সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল আরো অনেকেই পূর্ব হইতে সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন।

আমার কথা টিকিল না। গৃহিণী আমার কানে এবার ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন,—"মেয়েটা যে প্রথমে আমায় বল্লে ও স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে। স্বামী বলে এই লোকটাকেই দেখিয়ে দিলে কিনা।"

বলিলাম,—"তাহলে ত গোল মিটেই গেল।"

কিন্তু সমবেত সকলের প্রতিবাদে আমার এ সহজ মীমাংসা চাপা পড়িল।

স্থূলকায় ভদ্রলোক বলিলেন—"আহা তারপরের কথাই শুনুন না মশাই।"

যাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে তাহারা এখনই আসিয়া পড়িবে ভাবিয়া আমি শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলাম। সেদিকে কিন্তু ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া গৃহিণী বলিলেন,—"শ্বশুরবাড়ী আছে, অথচ শ্বশুরবাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করলে থতমত খেয়ে যায়। একবার বল্লে, শ্যামবাজারে আর এক বার ভুলে বলে ফেল্লে,—কলকাতা কখনও দেখিনি ভাই, বড় ভয় করছে। জিজ্ঞাসা করলাম—কলকাতায় তোমার শ্বশুরবাড়ী অথচ কলকাতা দেখোনি কি রকম?—তখন আর কোন কথা বলতে পারে না।"

ব্যাপারটা একটু সন্দেহজনক বলিয়াই মনে হইতেছিল। আমাদের আলোচনা বুঝিতে পারিয়া কিনা জানি না তাহারা আর দূরের জানালা হইতে নড়িবার চেষ্টা পর্যন্ত করিতেছিল না।

গৃহিণী বলিতেছিলেন,—"শুধু তাই নয়, হাত দুটো কাপড় দিয়ে ঢেকেই রেখেছে, একবার চাদরের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম, হাত দুটো একবারে ন্যাড়া, সধবা মেয়েছেলের হাতে একটা নোয়াও থাকে না নাকি?"

সকলেই উৎসুক হইয়া শুনিতেছে জানিয়া গৃহিণীর কণ্ঠ এখন লজ্জায় সত্যই মৃদু হইয়া আসিয়াছিল। অনেকেই সকল কথা শুনিতে পায় নাই। কিন্তু শুনিতে না পাইলেও লোকটা যে বদমায়েস এবং স্ত্রীলোকটিকে লইয়া পলায়ন যে সে করিতেছে একথা সকলেই যেন আগে হইতে টের পাইয়াছিল বলিয়া মনে হইল। সামনের এক ভদ্রলোক বলিলেন,—"ওকে ধরে এই খানে মার দেওয়া উচিত।"

এ কথাতেও সকলের সায় আছে দেখা গেল।

গৃহিণীর বক্তব্য তখনও শেষ হয় নাই। বলিলেন—"প্রথমে এসবেও আমার সন্দেহ হয় নি, বাপেরবাড়ী কোথায়, তাও পর্যন্ত যখন বলতে চাইল না তখনও এতটা বুঝতে পারিনি। কিন্তু খাওয়ার সময় ঘোমটা একটু ফাঁক করতেই দেখি,—সিঁথিতে একটু সিঁদুর পর্যন্ত নেই। লোকটার বদমায়েসের মত চেহারা তোমায় আগেই আমি বলি নি!"

আশেপাশে বদমায়েস লোকটিকে শাস্তি দিবার উপযুক্ত উপায় সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। স্থূলকায় ভদ্রলোক সকলকে থামাইয়া বলিলেন,—"আপনারা থামুন আমি মজা করছি, দেখুন।"

মজার প্রত্যাশায় সকলেই উৎসুক হইয়া উঠিলেন। গাড়ীর ভিতর কেলেঙ্কারীর সম্ভাবনায় অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিয়াও বাধ্য হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

ধীর পদক্ষেপে স্থূলকায় ভদ্রলোক আমাদের সকলের বর্তমান আসামীর নিকট গিয়া দাঁড়াইয়া বিচারকের মত জলদ-গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়ের নাম?"

লোকটা সত্যিই কেমন যেন ভড়কাইয়া গিয়াছিল, বলিল,—"আপনার তাতে দরকার?"

স্বর রুক্ষ হইলেও তাহার ভিতর যেন ভীতির আভাষ ছিল।

"আহা নাই বা রইল দরকার মশাই, নাম বলতেই বা আপনার এত ভয় কিসের!"

লোকটা নাম বলিল।

"তারপর মশায়ের কোথায় থাকা হয়?"

লোকটা পাল্টা প্রশ্ন করিয়া বলিল,—"আপনার কোথা থাকা হয়?" মুখ চোখ তাহার তখন আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের স্ব-নিযুক্ত প্রতিনিধি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন,—"শ্রীরামপুরে—আপনি?"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া লোকটা বলিল,—"ইটিলি।" সকলের মধ্যে একটা

সাড়া পড়িয়া গেল। হাত নাড়িয়া গাড়ীর মৃদুগুঞ্জন থামাইতে বলিয়া প্রতিনিধি মহাশয় বলিলেন,—"কোথা হতে আসা হচ্ছে ?"

লোকটা এবার উগ্রকণ্ঠে বলিল,—"আদালতের কাঠগড়ায় ত দাঁড়াইনি মশাই যে আপনার জেরার পর জেরার জবাব দেব।"

"আদালতে শীগগীরই দাঁড়াতে হবে যে!"

লোকটা রুখিয়া বলিল,—"কেন শুনি ? মুখ সামলে কথা বলবেন মশাই!"

স্থূলকায় ভদ্রলোকের মজা করা আর হইল না। মারিবার প্রস্তাব যে ভদ্রলোক করিয়াছিলেন তিনি বেঞ্চি হইতে সবেগে লাফ দিয়া উঠিয়া সদর্পে বলিলেন,—"চোপরাও বদমায়েস,—মেয়েমানুষ বার করে নিয়ে পালাচ্ছ আবার তম্বী! জুতিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেব।"

লোকটাও রুখিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"কী!"

"কি ? আবার—ন্যাকা সাজা হচ্ছে! কি করেছ জান না!"—ভদ্রলোক মারেন আর কি! গৃহিণী এবার ভয়ে লজ্জায় এতটুকু হইয়া গিয়াছিলেন।

লোকটা বলিল,—"সাবধান হয়ে কথা বলবেন মশাই। জানেন উনি আমার স্ত্রী!"

"খুব জানি, জানিয়ে দিচ্ছি এই যে!"

নেতৃত্ব যাওয়ায় বিরক্ত হইয়াই স্থূলকায় ভদ্রলোক বলিলেন,—"আহা আপনি আবার কথা কইতে এলেন কেন মশাই। দেখছেন আমি ব্যাপারটা বুঝছি।"

বাক্যযুদ্ধের মধ্যে ট্রেন আসিয়া স্টেশনে থামিয়া গেল। মারমুখী ভদ্রলোক বলিলেন,—"ব্যাপার আর কি বুঝবেন মশাই! এই যে দিচ্ছি আমি পুলিশে হ্যাণ্ডওভার করে!"

"কি পুলিশে ধরিয়ে দেবে ? এই যে আমি নিজেই যাচ্ছি পুলিশ ডাকতে! ভদ্রলোকের মেয়েছেলেকে ট্রেনের মাঝে অপমান করা বার করছি আপনাদের।"

লোকটা রাগে গরগর করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর লোকদের মধ্যে অপূর্ব এক পরিবর্তন ঘটিয়া গেল।

স্থূলকায় ভদ্রলোকের মুখ ভয়ে কালো হইয়া উঠিল। যিনি মারিতে

গিয়াছিলেন তিনি খানিক হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া নীরবে নিজের জায়গায় আসিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং খানিক বাদে হঠাৎ নিজের পুঁটলিটি তুলিয়া লইয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন—"ভাই-ভাইপোগুলোকে অন্য গাড়ীতে তুলে ভীড়ের চোটে এ গাড়ীতে উঠে পড়েছিলাম। যাই মশাই একবার দেখে আসি।"

স্থূলকায় ভদ্রলোক শশব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া বলিলেন,—"যাচ্ছেন কি মশাই! বেশ লোক ত আপনি! কেলেঙ্কারী বাধিয়ে এখন চুপি চুপি সরে পড়ছেন!"

"আমি কেলেঙ্কারী বাধিয়েছি কি রকম?"

"তা নয় ত কি আমি বাধিয়েছি! আমি ত ধীরেসুস্থে সব জেনে নিচ্ছিলাম। আপনি ত একেবারে মারতে উঠলেন, মেয়েছেলে বার করে নিয়ে যাচ্ছে বলে।"

"বা বেশ, আপনারাই বল্লেন—ওর স্ত্রী নয়! আপনিই আগে থাকতে সায়েস্তা করতে এগিয়ে গেলেন! দোষ হ'ল আমার?"

আমার স্ত্রীর প্রতি এবার বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্থূলকায় ভদ্রলোক বলিলেন,—"স্ত্রী নয়, আমি আগে বলেছি?"

এতক্ষণ কেহই কম আস্ফালন করেন নাই। এখন তাঁহাদেরই একজন পরম বিজ্ঞের মত বলিলেন,—"স্ত্রী নিয়ে ভদ্রলোক ট্রেনে যাচ্ছেন। ভাল করে খোঁজ না নিয়ে এত বড় অপবাদ আপনাদের দেওয়া কি উচিত হয়েছে? বেশ বড় রকমের ফ্যাসাদ বাধিয়েছেন মশাই।"

দুই জনেই গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া মনে মনে হাসি পাইতেছিল, বলিলাম,—"ট্রেন ত ছেড়ে দিলে মশাই। তিনি ত এলেন না পুলিশ নিয়ে।"

ভূতপূর্ব প্রতিনিধি উষ্ণস্বরে বলিলেন,—"এ স্টেশনে না আসে অন্য স্টেশনে ত আসবে মশাই! আপনাদের জন্যেই এই ফ্যাসাদ।"

হাসিয়া বলিলাম,—"আমরা কি ভদ্রলোককে মারতে যেতে বলেছিলাম।"

"আপনারাই ত কথা তুললেন!"

"তা হতে পারে। কিন্তু তখন ত শুনেছিলাম সন্দেহ আপনাদেরও আগে থাকতে হয়েছিল।"

"আমাদের? কখনো না। স্ত্রী কি-না, আমরা কেমন করে জানব মশাই।"

ইহার উপর আর কথা চলে না। সুতরাং চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিন্তু পরের স্টেশনেও লোকটার কোন চিহ্ন দেখা গেল না। গাড়ী ছাড়িয়া দিল এবং খানিক বাদে বিস্মিত হইয়া দেখিলাম অপরিচিতা মেয়েটি কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এ মন্দ বিপদ নয়। স্ত্রীকে বলিলাম,—"ওঁকে ওঁর শ্বশুরবাড়ীর ঠিকানা জিজ্ঞাসা কর। ওঁর স্বামী হয়ত ট্রেনে উঠতে পারেন নি। যদি তিনি কোন টেলিগ্রাম না করেন, আমরা ওঁর শ্বশুরবাড়ীতে টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি তাঁরা স্টেশনে এসে নামিয়ে নেবেন।"

গৃহিণীকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইল না। কথাগুলি জোরেই বলিয়াছিলাম। মেয়েটি তাহা শুনিবার পর আরো উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

হঠাৎ মনে একটা সন্দেহ জাগায় সচকিত হইয়া বলিলাম,—"লোকটা চালাকী করে সরে পড়ল না ত!"

সেই সন্দেহই বোধহয় মেয়েটির মনে জাগিয়াছিল, সে আকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু আশপাশের লোকেরা বিপদের সম্ভাবনা হইতে উদ্ধার পাইয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন মনে হইল।

বলিলাম,—"লোকটাকে ত তাড়ালেন, এখন মেয়েটির উপায়?"

ফ্যাসাদের আশঙ্কা কাটিয়া যাওয়ায় সাহস সকলের ফিরিয়া আসিয়াছিল। যিনি মারিতে উঠিয়াছিলেন তিনি উষ্ণ হইয়া বলিলেন,—"তাড়াবে না ত কি, এ কাজে সাহায্য করতে বলেন নাকি আপনি?"

"না, তাড়িয়েছেন বেশ করেছেন, কিন্তু মেয়েটিরও ত একটা উপায় করা দরকার।"

কোন দিক হইতে আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। নিজেদের কর্তব্য

সম্পাদন করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের সামাজিক বিবেককে সম্পূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। আর তাঁহাদের দায় কিসের ?

স্থূলকায় ভদ্রলোক তাঁহার জিনিস পত্র গুছাইতে স্বরু করিয়াছেন। শ্রীরামপুরে তাঁহাকে নামিতে হইবে। মোট ঘাট দরজার কাছে আগাইয়া রাখিয়া তিনি বলিলেন,—"উপায় আমরা কি করব ? আমাদের কি উপায় জিজ্ঞাসা করে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল ?"

শরতের প্রথম কুয়াশা

নিরঞ্জন অমন পুরো একটা টাকা 'বয়'কে বখশিস দিয়ে ফেলবে সে কি নিজেই জানত!

কিন্তু এক টাকা কি, ক্ষমতা থাকলে আজ সে কল্পতরু হ'য়ে বসত। সসাগরা পৃথিবী দান ক'রে ফেলা তার পক্ষে আজ কিছুই নয়!

নিজের সৌভাগ্য সে বিশ্বাস করতেই পারে না ভাল ক'রে!

কিভাবে সন্ধ্যা থেকে একটা রাত তার কাটল!

অতসী—সেই একমাত্র অতসী ঘোষ,—ফ্যাশান সম্বন্ধে যার ইংরাজী লেখাগুলো সবচেয়ে দামী, সবচেয়ে অভিজাত ইংরাজী সাপ্তাহিকে কলেজের মেয়েরা পড়বার জন্যে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাকে, তিনবেলা তিনখানা মোটরে যারা চড়ে, তাদের মহলে যে অতসী ঘোষের নামে প্রতিদিন নতুন গুজব, নতুন কুৎসা রটে ও মুখে মুখে ফেরে, নতুন পাখনা-ওঠা বড় ঘরের ছেলেরা যার সম্বন্ধে,—"আলাপ হ'ল তোমাদের অতসী ঘোষের সঙ্গে সেদিন অমুক পার্টিতে। সত্যি হতাশ হ'লাম। কেন যে নাম করতে তোমরা গলে পড়···" একটু ঠোঁট বেঁকিয়ে বলতে পারলে ধন্য হ'য়ে যায়, সেই অতসী ঘোষ টেবিলের ওপরে মাত্র এক হাত তফাতে আর সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে বসেছে, হোটেলের কামরায়! শুধু কি বসেছে, উচ্ছ্বসিত ভাবে হেসেছে, অজস্র কথা কয়েছে, টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে এবং নিজে থেকে একবারও ওঠবার নাম করে নি!

না, একথা বল্লে কে বিশ্বাস করবে যে, সে, নিরঞ্জন—বন্ধুদের কাছে বাক্‌পটুতার জন্যে যে অন্ততঃ বিখ্যাত নয়, অতসী ঘোষের কথার পিঠে এমন জুৎসই জবাব দিয়েছে যে দীর্ঘ গ্রীবা হেলিয়ে চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে উৎক্ষিপ্ত হাসির ফোয়ারা অতসী ঘোষ আর থামাতে পারে নি!

আহা, কি সে কথাটা? মনে পড়ছে না এখন, কিন্তু তখন তার মুখে যেন কথাটা আপনি এসে জুগিয়ে গেছল! সে নিজেই অবাক হয়ে গেছে।

অবাক হয়ে গেছে সব কিছুতে। ব্যাপারটাকে অলৌকিক ছাড়া আর কি বলা যায়! অতসী ঘোষ শুধু যে একটি সন্ধ্যা তার সঙ্গে কাটিয়েছে তা নয়, তার সঙ্গ রীতিমত পছন্দ করেছে বলা যেতে পারে।

সেই বরং এক সময়ে একটু লজ্জিতভাবে বলেছে,—"আপনার এন্‌গেজ্‌মেণ্ট কিন্তু বোধ হয় আর রাখতে দিলাম না।"

"সেজন্যে আপনার কাছে ঋণী হয়ে রইলাম"—ব'লে অতসী ঘোষ হেসেছে।

"একটা অ্যাস্‌পিরিন বাঁচল।"

"অ্যাস্‌পিরিন!"

"হ্যাঁ, একটা অ্যাস্‌পিরিন লাগত, এন্‌গেজমেণ্ট শেষ ক'রে মাথাধরা সারাতে।"

তারপর দুজনের কি সম্মিলিত হাসি!

এসব কথা কাউকে কি বলা চলে! বললে, হেসে উড়িয়ে দেবে না বন্ধুবান্ধব! হাঁ একবেলার আলাপে অতসী ঘোষ গেছল তার সঙ্গে হোটেলে। তাও কিনা ফির্‌পো নয়, গ্র্যাণ্ড নয়,—হ্যান্‌কিং-এ, আবার ট্যাক্সিতে!

কিন্তু সত্যিই ত অতসী ঘোষের সঙ্গে তার একবেলার পরিচয়।

গিয়েছিল পরিতোষ লাহিড়ীর ছবির প্রাইভেট এক্‌জিবিশনে। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা গোণাগুন্তি, তারই মধ্যে একজন হবার সৌভাগ্যেই সে তখন গর্বিত। পরিতোষ লাহিড়ীর ছবিতে চড়া রঙের বর্বর বাহুল্য, আধুনিক নীরস সভ্যতার ফ্যাকাশে ছবির বিরুদ্ধে এই তার বিদ্রোহ ব'লে সে প্রচার করতে চায়। কিন্তু নিরঞ্জনের কাছে ঘরে সমস্ত রঙের সমারোহ ম্লান হয়ে গেছল প্রথমেই অতসী ঘোষের সঙ্গে পরিচয় হয়ে।

পরিচয় হয়েছে অনেকের মধ্যে একজন ব'লে;...আর ইনি নিরঞ্জন রায়, দেখেছেন বোধ হয় এঁর উড্‌কাটের কাজ?

কিন্তু অনেকের মধ্যে একজন হ'লে কি হয়। অতসী ঘোষ তার দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছে। হাত তুলে নমস্কার করেছে হেসে, সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা, বলেছে—

"বাঃ দেখিছি বই কি! আমি ওঁর একজন অনুরাগী!"

এরপর অতসী ঘোষের সঙ্গে যদি সে একটু জোর ক'রে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা ক'রে থাকে তাহলে তাতে দোষটা কিসের?

খারাপ লাগলে অতসী ঘোষ ত নিজে থেকে সরে যেতে পারত। তার বদলে অতসী ঘোষই ত ঘরের এক কোণে অপেক্ষাকৃত নির্জনে তাকে একটা ছবি দেখিয়ে বলেছে ;—

"আচ্ছা ফ্র্যাঙ্কলি, এই নকল বর্বরতা নতুন রকম ন্যাকামি ব'লে মনে হয় না আপনার? বেশ একটু আন্‌হেল্‌দি? যেমন ধরুন কাফ্রী মেয়েটা সমস্ত কাফ্রীজাতের অপমান নয় কি? ও ত ফ্রয়েড-পড়া সেক্সলজি-ঘাঁটা আর্টিষ্টের মনের একটা প্যাথলজিক বিকার!"

নিরঞ্জন একটু হেসেছে মাত্র।

অতসী আবার বলেছে,—"ও নন-কমিট্যাল হাসির মানে বুঝি। আপনার প্রফেশন্যাল লয়াল্‌টিতে বাধছে, এই ত! কিন্তু আমার ত ধারণা ছিল আর্টিষ্টরা ডিলাইট্‌ফুলি স্পাইটফুল; বন্ধুর কেচ্ছা করতে পেলে তারা আর কিছু চায় না।"

"আমার ওপর সে ধারণাটা বুঝি কষে নিচ্ছিলেন!"

"না, না, আমি লজ্জিত হলাম,"—ব'লে অতসী ঘোষ উচ্চৈঃস্বরে হেসেছে।

পরিতোষ লাহিড়ী এবং আরো দু'চারজন কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলেছে,—"ভাল একটা কিছু মিস্‌ করলাম ব'লে মনে হচ্ছে!"

"তা করলেন, কিন্তু দোহাই, রিপিট করতে বলবেন না।"

তারপর খুচরো আলাপ চলেছে খানিকক্ষণ, অনেকে এসে দলে জুটেছে, অনেকে আবার সরে গেছে, কিন্তু নিরঞ্জন আর অতসী বিচ্ছিন্ন হয় নি। শুধু কি তা' নিরঞ্জনের চেষ্টায়?

এক সময়ে হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে চেয়ে অতসী বলেছে,—"এই দেখ, আর একটু হলেই ভুলেছিলাম! আমায় যেতে হচ্ছে পরিতোষবাবু!" তারপর সকলের ওপর একবার আলগোছা দৃষ্টি বুলিয়ে বলেছে,—"আমায় একটু লিফ্‌ট দিতে পারে কে?"

"যদি কিছু মনে না করেন"—বলতে বলতে নিরঞ্জনের চোখ মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে লজ্জায়। গায়ে পড়ে এমন ক'রে ঘনিষ্ঠতা সে কি ব'লে করতে গেল!

সবাই তাকে কি ভাবছে, তার পেছনে সবাই কি বলবে, পরিতোষ লাহিড়ীর ঈষৎ বাঁকান ঠোঁট দেখেই সে বুঝতে পেরেছে। এর ওপর অতসীই যদি না যেতে চায়?

কিন্তু হাসিমুখে অতসী ঘোষ বলেছে,—"ও, অজস্র ধন্যবাদ! চলুন তাহ'লে।"

সকলের চোখ সযত্নে এড়িয়ে নিরঞ্জন সিঁড়ি দিয়ে অতসীর পাশাপাশি নেমেছে।

তারপর নীচে গিয়ে ট্যাক্সি ডাকার সে আর এক লজ্জাকর ব্যাপার। লিফ্‌ট দিতে হ'লে যে নিজের গাড়ী থাকা দরকার তা কি আর নিরঞ্জন জানে না, তবু বেপরোয়াভাবে প্রস্তাব করবার সময় এতটা কেলেঙ্কারী হবে সে ভাবে নি।

কাছাকাছি কোনও ট্যাক্সি নেই। অতসীকে একলা দাঁড় করিয়ে রেখে অনেকক্ষণ বাদে অনেক দূর থেকে সে ট্যাক্সি নিয়ে এসেছে। আসতে আসতে ভেবেছে, গিয়ে হয়ত অতীসকে দেখতেই পাব না। দেরী দেখে বিরক্ত হয়ে একাই চলে গেছে।

কিন্তু না, অতসী ঘোষ তখনও দাঁড়িয়ে। বরং নিজেই ব'লেছে,—"আপনাকে বেশ একটু কষ্ট দিলাম।"

এর উত্তরে বলা উচিত ছিল,—"না, না, কষ্ট ত আপনারই হল এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে,"···কিন্তু নিরঞ্জন বলতে পারে নি। সব কেমন গুলিয়ে গেছে, ট্যাক্সির দরজা খুলে ধরবার ব্যগ্রতায়, অতসীকে ফিরে দেখতে পাওয়ার উত্তেজনায়!

পৌঁছে দেবার কথা বুঝি থিয়েটার রোডে। কিন্তু কেমন করে ট্যাক্সি শেষ পর্যন্ত চীনে হোটেলের সঙ্কীর্ণ রাস্তায় গিয়ে পড়েছে তা নিরঞ্জন এখনো ভাল ক'রে ভাবতেই সাহস পায় না। কোথা দিয়ে কি কথাটা উঠেছে, চোখ কান বুজে মরিয়া হয়ে সে কেমন ক'রে হোটেলে যাওয়ার আজগুবি প্রস্তাব করেছে, কি ভাবে হেসে না উঠে বা গম্ভীর না হ'য়ে গিয়ে অতসী রাজি হয়েছে, সব তার মনে গুলিয়ে গেছে।

নিরঞ্জন বুঝি বলেছিল,—"লক্ষ্য করেছেন! আজ বোধ হয় আমরা শরতের প্রথম কুয়াশা দেখলাম!"

"ঠিক বলেছেন! তাই ভাবছিলাম কলকাতাটা হঠাৎ এমন রহস্যময় হয়ে উঠল কি ক'রে!"

নিরঞ্জনের দুঃসাহসের পরিচয় পাওয়া গেছে আবার,—"আমার কাছে রহস্যময় হয়ে ওঠার আরো বড় কারণ আছে!"

অতসী তার দিকে চেয়ে হেসেছে।—"কারণটা তলিয়ে বুঝতে সাহস করলাম না কিন্তু!"

ঠিক অর্থটা ধরতে না পারলেও নিরঞ্জন হেসেছে।

খানিকবাদে আবার সাহস করে বলেছে,—"মনে হচ্ছে আপনার গন্তব্য স্থান আরো একটু দূর হ'লে ভাল হ'ত!"

"কার পক্ষে? ড্রাইভারের ত নিশ্চয়ই!"

"মিটারের হিসেব কি একমাত্র হিসেব?"

"আর সব ত হিসাবের বাইরে!"

"কিন্তু বেহিসেবের দিনও ত আসে। ধরুন আজ এই শরতের প্রথম কুয়াশার সন্ধ্যা, এটা কি হিসেব ক'রে খরচ করবার?"

"যেমন এন্‌গেজমেণ্ট রাখতে? তাই বলতে চাইছেন কি?"

"তাই যদি বলি।"

"কিন্তু বেহিসাবী খরচ করি কোথায়?"

নিরঞ্জন সোজা বলে বসেছে,—"যদি আমি হঠাৎ এখন ট্যাক্সি ঘোরাতে বলি, যদি হঠাৎ..."

তাকে বাধা দিয়ে অদ্ভুতভাবে হেসে অতসী বলেছে,—"যদি নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ আছে কি?"

সে হাসি ও চোখের দৃষ্টিতে কি সাহস পেয়ে কে জানে, নিরঞ্জন হঠাৎ ট্যাক্সি ঘোরাতে হুকুম দিয়েছে।

তারপর! তারপর সে অর্ধেক রাত কলকাতার রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে

পারত! কিন্তু তার সে অর্থের সামর্থ্য কোথায়! তাই তারপর হোটেলে গিয়ে উঠেছে। তবু অনেকক্ষণ এক সঙ্গে থাকা যাবে।

জামা কাপড় না ছেড়েই নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিরঞ্জন সমস্ত ঘটনাগুলো মনের মধ্যে অধীর আনন্দে পুনরাবৃত্তি করতে করতে হঠাৎ বাধা পেল এক জায়গায়।

হোটেলে গিয়ে থামবার পর অতসী বলেছিল,—"আপনার 'যদি' এইখানেই শেষ!"

তখন গলার স্বরে বুঝি ঈষৎ খট্‌কা লেগেছিল নিরঞ্জনের ; তারপর হোটেলের কামরার উচ্ছ্বসিত আনন্দে সব ভুলে গেছে।

কিন্তু…

নিরঞ্জন বিছানা থেকে উঠে পায়চারী করতে সুরু করে।

কিন্তু সমস্তটাই যদি অতসী ঘোষের কাছে একটা মজার তামাসা হয়! হওয়া কিছুই আশ্চর্য ত নয়। নিরঞ্জনের ভাবনা একেবারে উল্টোদিকে মোড় ফেরে। সমস্ত ব্যাপারটাকে নিজের মনের ভাবাবেগের কুয়াশায় সে ত এতক্ষণ মধুর ক'রে দেখেছে। কিন্তু সে দেখা কি সত্য? ভাবতে গেলে অতসী ঘোষের সব কথা, সব খুঁটিনাটি আচরণেরই ত অন্য মানে করা যায়। সেই মানেটাই ত স্বাভাবিক।

নিজেকে সে ত গোড়া থেকেই হাস্যাস্পদ করে তুলেছে, সুযোগ দিয়েছে তামাসার—অতসীর জীবনের বোধ হয় সবচেয়ে বড় তামাসার। অতসী ঘোষ আগাগোড়া মনে মনে হেসেছে। নিজেকে ছেড়ে দিয়ে দেখেছে কোথায় গিয়ে এ তামাসা শেষ হয়!

তার প্রথম লিফ্‌ট দেবার প্রস্তাব! ট্যাক্সি আনা নিয়ে কেলেঙ্কারী! অতসী ঘোষ ইচ্ছে ক'রেই তখন চলে যায় নি। ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা করবার মত মজা সে পেয়েছে তখনই ;—তারপর সেই ট্যাক্সি ফেরানর ব্যাপার।

অতসী ঘোষকে সে কোথায় নিয়ে গিয়ে তুলেছিল!

আপনার 'যদি' কি এইখানেই শেষ!

নির্বোধ সে—তাই কিছুই বোঝে নি। অতসী ঘোষকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়েও বলেছে,—"আমার ধৈর্য বড় কম, আবার কবে কার প্রাইভেট এক্‌জিবিশন হবে সে জন্য অপেক্ষা করতে হয়ত পারব না।

অতসী ঘোষ বলেছে,—"বলেছি ত, 'যদি' 'হয়ত' এগুলো নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।"

"আচ্ছা তবে 'হয়ত'-টা বাদ দিলাম!"—ব'লে সে ফিরে এসেছে।

আর অতসী ঘোষ হয়ত ঘরে পৌঁছান পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে নি প্রাণ খুলে হাসবার জন্যে।

দুটো হাতের ভেতর মাথা গুঁজে সে বিছানার উপর ব'সে পড়ে। না, যা হয়েছে তা আর ফেরাবার নয়—কিন্তু তামাসার খোরাক সে জোগাবে না।···জোগাবে না—

অতসী ঘোষের কাছেও বিদায় নিয়ে আসা উচিত নয় কি!

অতসী ঘোষ তখন ব'সে আছে ড্রেসিং-টেব্‌লের সামনে কোল্ড ক্রিমের পাত্রে আঙুল ডুবিয়ে—ক্লান্ত চোখে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে। সে প্রতিবিম্ব আর কেউ বোধ হয় দেখে নি। সেই ক্লান্ত মুখের রেখা, ক্লান্ত চোখের সেই অতল হতাশা।

সে-ও ভাবছে বইকি সমস্ত সন্ধ্যাটার কথা। এমন সন্ধ্যা তার জীবনে বিরল হয়ে এসেছে। হয়ত আর আসবে না। নগরের ওপর শরতের প্রথম কুয়াশা আবার নামবে, কিন্তু এমন উদ্দাম যৌবনের সান্নিধ্য, যৌবনের এমন উচ্ছ্বসিত স্তুতি আর সে পাবে না।

সে স্তুতি জাগ্রত রাখবার শক্তিই যে আর তার নেই—সেইখানেই যে তার ভয়। এখনো সে চোখ ধাঁধিয়ে দিতে পারে—প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তে। কিন্তু স্থির দীপ্তি দিতে পারে না, তাই উচ্ছ্বসিত স্তুতির উৎস ধীরে শুকিয়ে আসার ট্র্যাজেডি তার জীবনে ঘটে গেছে।

আর তা ঘটতে দিতে সে চায় না। তার অস্তমান যৌবনের আকাশে এই শেষ স্তুতির তারকা থাক অম্লান হয়ে।

নিরঞ্জনের দৃষ্টি-বিভ্রম কাটাবার সুযোগ সে দেবে না।

ব্যাহত রচনা

মধুর সন্ধ্যাটা মাটি হইয়া গেল।

প্রশস্ত বারান্দায় ডেক-চেয়ারটা টানিয়া বসিয়াছিলাম। দূরের বন্ধুর ঊষর মাঠ পার হইয়া শীর্ণ আঁকা-বাঁকা বালু-নদী ছড়াইয়া দৃষ্টি, ওপারের নব পত্রোদ্গমে সবুজ মেঘপুঞ্জের মত মনোহর, শালবনের উপর গিয়া পড়িয়াছিল। সূর্য এইমাত্র, আরো দূরে মেঘের মত ধূসর ও অস্পষ্ট পাহাড়ের অন্তরালে অস্ত গিয়াছে। গোধূলির ম্লান অথচ মধুর আলোয় দিগন্তব্যাপী রাঙামাটির দেশের অরণ্যের এমন একটি অপরূপ রূপ হইয়াছে, যাহাকে মধুর একটি প্রেমের গল্পের পশ্চাৎ-পট হিসাবে ব্যবহার করিবার লোভ কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিতেছিলাম না। মধুর প্রেমের গল্পটিই বুঝি মনে মনে রচনা করিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় কান্নার শব্দে চমক ভাঙ্গিয়া গেল।

অত্যন্ত বাস্তব, অত্যন্ত শ্রুতিকটু কান্নার শব্দ!—আসিতেছে, আমাদেরই বাড়ীর পিছনের খোলার চালের একটি ঘর হইতে।

একটু বিস্মিতই হইলাম। ঘরটিতে থাকে আমাদের জলওয়ালা বনোয়ারী। তাহার জীবনে আকুল হইয়া কাঁদিবার মত কি এমন দুঃখ থাকিতে পারে, ভাবিয়া পাইলাম না। দশ বছর ধরিয়া তাহাকে দেখিয়া আসিতেছি। কাঁদিবার বা হাসিবার মত কোন ব্যাপার তাহার জীবনে ঘটিতে পারে এ কথা কখনও মনে হয় নাই। লোকের বাগানে বাগানে কূয়া হইতে জল সরবরাহ করিয়া সে জীবিকা অর্জন করে! আজ দশ বৎসর ধরিয়া তাহাই করিয়া আসিতেছে। কোন কুলে কেহ তাহার নাই। নিজের রোজগারে কোন রকমে দিন তাহার চলিয়া যায়। ইহার বেশী কোন পরিচয় তাহার পাই নাই। ইহার অধিক তাহার পরিচয় নাই বলিয়াই মনে করিয়াছি। আজ হঠাৎ সন্ধ্যার

এই মধুর অবকাশে তাহার হৃদয়ের কি রহস্য কর্কশ ক্রন্দনস্বরে উদঘাটিত হইয়া গেল!

বনোয়ারী মানুষটা অবশ্য ভারী অদ্ভুত। কিন্তু সে শুধু বাহিরে। বিধাতা তাহাকে ব্যঙ্গ-রচনা হিসেবেই যেন গড়িয়েছেন। লম্বার বদলে তাহাকে সরু বলিলেই যেন বর্ণনা যথাযথ হয়। হাত-পাগুলা কেমন যেন বেকায়দায় জোড়া লাগিয়েছে। সামঞ্জস্য কোথাও নাই। চেহারায় মেয়েলী ভাবের যে আভাস আছে, গলার স্বরে তাহা পূর্ণ হইয়াছে।

কিন্তু বাহিরের চেহারায় এই বিশেষত্ব তাহার ভিতরের জীবনের বৈচিত্র্য-হীনতারই আবরণ বলিয়া জানি। দশবৎসর ধরিয়া সে জল তুলিয়া আসিতেছে, সারা জীবনই তুলিয়া চলিবে। কূয়ার উপরকার কপিকলটার মতই সুনির্দিষ্ট তাহার জীবনের গতি। তাহার জীবনে কান্নার আবার অবসর কোথায়?

কিন্তু অনুসন্ধান লইয়া যাহা জানিলাম তাহাতে বনোয়ারীর দুঃখে সহানুভূতি অনুভব করিলেও মনে মনে বুঝি না হাসিয়া পারিলাম না।

শুনিলাম বনোয়ারী তাহার ওই ছোট খাপরার ঘরটির ভিতর সকলের অজ্ঞাতে আজ বহু বৎসর ধরিয়া অর্থ-সঞ্চয় করিয়া আসিতেছে। সকাল বিকাল নিজেকে সকল প্রকারে বঞ্চিত করিয়া পরিশ্রমের টাকা যে সে জমাইয়াছে ইহাই শুধু তাহার সম্বন্ধে জানিতাম না।

সেই রক্তজলকরা পরিশ্রমের দ্বারা সঞ্চিত সমস্ত টাকা তাহার চোরে কেমন করিয়া চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।

শোক তাহার কিন্তু শুধু সেই সযত্নসঞ্চিত অর্থের জন্য নয়, তাহার চেয়ে অনেক মূল্যবান জিনিস সে হারাইয়াছে। আজ দশ বৎসর ধরিয়া বনোয়ারী অর্থ সংগ্রহ করিতেছিল বিবাহ করিবার জন্য। তাহাদের সমাজে নারীর মূল্য এখনও লোপ পায় নাই। বয়সের অনুপাতে সে মূল্য বাড়ে কমে। বনোয়ারীর সঙ্গতি অল্প। মাত্র দু'কুড়ি টাকা সে এতদিনে সঞ্চয় করিয়াছে। তাই সে দশ বৎসরের উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে সাহস পায় নাই। কিন্তু দশম বর্ষীয়া যে নারীর প্রেম তাহার

জীবন অলঙ্কৃত করিবার কথা, তাহার প্রতি আজ পাঁচ বৎসর ধরিয়া সে একনিষ্ঠভাবে দৃষ্টি রাখিয়া আসিয়াছে।

এইভাবে সমস্ত টাকা চুরি যাইবার পর আর সেই রমণীরত্নকে গৃহে আনিবার কোন আশাই রহিল না। দিনের পর দিন বয়স তাহার বাড়িবে এবং সেই অনুপাতে মূল্যও। বনোয়ারী তাহার নাগাল আর কোন দিন পাইবে না।

বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কর্কশ মেয়েলী কণ্ঠে বনোয়ারী সেই দুঃখের কথাই জানাইতে থাকে। আশেপাশেও অনেকে তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সমবেত হইয়াছে। চোর ধরিবার ফন্দিও তাহাকে অনেকে অনেক রকমে বুঝাইয়া দেয়। কিন্তু বনোয়ারীর কাহারও কথায় কান নাই।

বনোয়ারীকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা বৃথা বুঝিয়া, এবার সেখান হইতে পথে বাহির, হইয়া পড়িলাম। অন্ধকার ইতিমধ্যে বেশ ঘোরালো হইয়া আসিয়াছে। নির্জন রাস্তাটির উপর নামিয়াছে অপরূপ রহস্য-ঘনিমা। মধুর প্রেমের গল্পের ছিন্নসূত্র এখনও বুঝি জোড়া দেওয়া চলে। সেই চেষ্টাই করিয়া দেখিলাম।

মনে হইল এই রহস্য-স্নিগ্ধ পথের অন্ধকারে যেন কাহারা দুইজনে পাশাপাশি চলিয়াছে। মুখ কেহ কাহারও দেখিতে পায় না, তাই বুঝি হাত ধরিতে হয়।

উষ্ণ কোমল হাত, কেমন একটু কম্পমান, সঙ্কোচে না ভয়ে!

"তোমার হাত কাঁপছে!"

"তাই নাকি? হবে বোধ হয়।"

"ভয় পেয়েছ নাকি?"

"পেয়েছি একটু।"

"ভয় কেন?"

"তোমাকে ভয় হয়!"

"হাত ধরেছি বলে?"

"না, ছেড়ে দেবে ভেবে।"

"তুমি ত জান!"

"জানি। কিন্তু কতটুকু! মনে হয় সবই বাকী রইল, সমস্তই রইল আড়াল।"

"শুধু মন দিয়ে জানাবার চেষ্টা করেছ!"

"না, সমস্ত সত্তা দিয়ে তোমায় খুঁজেছি, কিন্তু তবু পাওয়া যায় না। তোমার হাত ধরেছি কিন্তু মুখ তোমার দেখা যায় না।"

"আমি কিন্তু তোমার মুখ অনুভব করতে পারছি—তোমার সমস্ত সত্তা। অন্ধকার আমার কাছে নেই।"

"আমি দুর্বল, আমার সংশয় আসে। মনে হয়, হয়ত হাত ছেড়ে যাবে।"

"আজ ত যায় নি, এইটুকুই যথেষ্ট!"

"কিন্তু আমি যে অতীত আর ভবিষ্যৎকে তোমার মত ভুলে থাকতে পারি না। সামনে পেছনে না তাকিয়ে আমার উপায় নেই।"

"সে তোমাদের—মেয়েদের ধর্ম!"

"হবে হয় ত। আমাদের হ'ল কালের সঙ্গে চুক্তি, আর তোমাদের কালকে উপেক্ষা, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। আমাদের প্রেমই হয়ত ছল মাত্র,—আত্মপ্রতারণা! আমরা চাই ঘর বাঁধতে কায়েমী করে, সেই সঙ্গে তোমাদেরও।"

"কিন্তু তোমাদের সেই বন্ধনে আমাদের বেগই বাড়ে, তীরের বন্ধনে যেমন নদীর।"

"অর্থাৎ বলতে চাও, নদী যায় তীরকে ছাড়িয়ে।"

"যায়, তবু ছাড়াতে পারে না। তীর থাকে সঙ্গে সঙ্গে—"

"এই হ'ল পুরুষের ট্র্যাজিডি তা'হলে!"

"তা ত বলিনি। একদিকে বেগ আর একদিকে বন্ধন, এই নিয়েই ত মাধুর্যের লীলা!"

"কিন্তু কান্নাটা শুধু আমাদের, স্রোতকে বেঁধে না রাখতে পারার কান্না।"

আমার রচনা হঠাৎ থামিয়া গেল। পথে গাঢ় অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে, কল্পনার ছায়ামূর্তি তাহার ভিতর যাইতেছে মিলিয়া। মধুর গল্প রচনা করিবার জন্য যাহাদের ডাকিয়াছিলাম, তাহারা আমার কাহিনীকে এ কোন নিরর্থক কথার

জটিলতায় লইয়া আসিল ! না, দোষ তাহাদের নাই। একটি কর্কশ কান্নার স্বরে সমস্ত গল্পের সুর অনেক আগেই কাটিয়া দিয়াছে। কোনমতেই তাহাকে আর জোড়া দেওয়া যাইবে না। মনের নেপথ্যে বনোয়ারীর কান্না কিছুতেই আর ভুলিতে পারিতেছি না। সে কান্নাকে আর তেমন হাস্যকর বলিয়াও মনে হয় না। হাতে হাত ধরিয়াও যাহারা পরস্পরকে হারাইয়া ফেলে অর্থহীন কথার জটিলতায়, তাহাদের তুলনায় বনোয়ারীর বেদনা এমন কি অস্বাভাবিক !

নারী শুধু নয়, পুরুষও ঘর বাঁধিতে চায়, বনোয়ারী তাহারই জন্য সুদীর্ঘ দশ বৎসর ধরিয়া তপস্যা করিয়াছে। তাহার ঘরণীর বয়স মাত্র হয়ত দশ। আজ তাহাকে ঘরে আনিতে পারিলেও আরও পাঁচ বৎসর হয়ত বনোয়ারীকে প্রথম প্রিয়-সম্ভাষণের জন্য অপেক্ষা করিতে হইত। বার্ধক্যের প্রান্তে না পৌছাইয়া সে প্রিয়ার দেখা পাইত না। কিন্তু তাহাতে তাহার তপস্যার মহিমা ত কিছু ম্লান হয় না। তপস্যার মূল্য ত সুলভ সার্থকতায় নয়।

আবার বাড়ীর দিকেই ফিরিলাম। বনোয়ারীর ঘরের দিক হইতে এখনও কান্নার শব্দ মাঝে মাঝে আসিতেছে। যাহারা তাহাকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছিল, তাহাদের কেহ আর এখন উপস্থিত নাই। তাহাকে বুঝাইতে না পারিয়া তাহারা বোধ হয় বিরক্ত হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছে।

তাহার ঘরের দরজায় গিয়া ডাকিলাম,—"বনোয়ারী"।

বনোয়ারী দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। এক বেলার মধ্যে এতখানি সে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে না দেখিলে বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। আশ্চর্য হইবার অবশ্য কিছু নাই।

এই নিঃসঙ্গ ধূসর জীবনে একটি মাত্র স্বপ্ন সে পরম আগ্রহে দীর্ঘ দশ বৎসর ধরিয়া লালন করয়িাছে। সে স্বপ্ন নির্মমভাবে ভাঙ্গিবার পর আর কোন সম্বলই তাহার রহিল না। ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া কোন আশার রেখাও সে দেখিতে পায় না। দিনের পর দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া আধাপেটা খাইয়া আবার কতদিনে সে যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবে কে জানে !

তাহাকে ডাকিয়া লইয়া নিজের ঘরে গেলাম। বনোয়ারী নানা জনের

প্রশ্নে-পরামর্শে ইতিমধ্যে বোধ হয় ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছে। নিরুপায় হইয়া অনিচ্ছুক ভাবেই যেন সে আমার সঙ্গে গেল।

মধুর গল্প রচনা করা হইল না বটে, কিন্তু মনে হইল, সন্ধ্যাটা একেবারে মাটি হইয়া যায় নাই। এত সুলভে মানুষকে এতখানি সুখী করিবার সুযোগ অল্পই মেলে।

পরিত্রাণ

অনুপমা আশ্রয় পাইল।

বিশেষ কোন আশা না রাখিয়াই সে একটা চিঠি লিখিয়া দিয়াছিল পরিতোষকে,—যেমন আরো দু-এক জায়গায় লিখিয়াছে।

কিন্তু পরের দিনেই চিঠির জবাব আসিল। একই সহরের মধ্যে চিঠির জবাব অবশ্য এবেলা ওবেলার মধ্যে আসিতে পারে—সে কথা নয়। তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া উত্তর পাঠাইতে বেশী বিলম্ব হয় নাই এইটুকুই আনন্দের ও বিস্ময়ের নয় কি?

কিন্তু চিঠির জবাব লিখিয়াছে স্বয়ং পরিতোষ নয়। লিখিয়াছে তাহার ম্যানেজার। যে বাড়ীটির কথা অনুপমা বলিয়াছিল, সেটি এখন সারান হইতেছে। ম্যানেজার সবিনয়ে সেকথা জানাইয়া লিখিয়াছে, আপাততঃ অনুপমা তাহার ছেলে ও ভাইকে লইয়া পরিতোষের নিজের বাড়ীর এক অংশে বাস করিতে পারে; যাহাতে তাহাদের কোন অসুবিধা না হয় সে বিষয়ে যে যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা হইবে একথা জানাইতেও ভোলে নাই।

পরিতোষ নিজে না লিখিয়া ম্যানেজারকে দিয়া চিঠি লিখাইয়াছে ইহাতে অনুপমার অপমান বোধ করিবার কথা। কিন্তু অপমান-বোধও সময় হিসাবে মানায়। অনুপমার সে সময় নয়।

আর সত্যই পরিতোষ তাহার চিঠি পাইবামাত্র সাগ্রহে নিজে চিঠির জবাব দিবে এ আশা করিয়া যদি সে চিঠি দিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার নিজেকেই ধিক্।

মনের কোণে তেমন কিছু থাকিলে বুঝি সে এ চিঠি লিখিতেই পারিত না।

সে সব দিনের কথা সত্যই কি তাহার মনে আছে, না তাহা মনে করিয়া রাখিবার মত!

ধূলি-ধূসর

সহৃদয়, উদার, দশজনের উপকারী লোক, বিশেষ করিয়া তাহার স্বামীর এক কালের বন্ধু বলিয়াই অনুপমা তাহার কাছে বিপদের দিনে সামান্য একটু সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়াছে।

সাহায্যও এমন কিছু বেশী নয়। পরিতোষের একটি ভাড়াটে বাড়ীতে মাত্র কয়েক মাসের জন্য সে থাকিতে চাহিয়াছে। তাও একেবারে অমনি নয়; ভাড়াটা কিছু কম করিয়া দিয়া মাত্র।

কিছুদিন ধরিয়া বাড়ীটা খালি পড়িয়া আছে বলিয়া অনুপমার ভাই শরৎ আসিয়া একদিন খবর দিয়াছিল। অনুপমা তাহার পর কয়েকদিন ধরিয়া ভাবিয়াছে এ বিষয়ে পরিতোষকে কিছু বলা যায় কি না। তারপর একদিন একটা চিঠি ভাইকে দিয়া নিজের নামেই লিখাইয়াছে। অনুপমা কোন প্রকার দুঃখের কাঁদুনি অবশ্য সে চিঠিতে গায় নাই। তাহার সে স্বভাব নয়। প্রয়োজনও ছিল না। সে শুধু তাহার বাবার মৃত্যু-সংবাদটা দিয়া জানাইয়াছে যে, কয়েক মাস পরে তাহাকে কলিকাতা ছাড়িয়া দেশের বাড়ীতেই আশ্রয় লইতে হইবে। শুধু ভাই-এর পরীক্ষার পূর্বের কয়েকটা মাস কলিকাতায় থাকিতে পারিলে ভাল হয়। তাহার বাবার মৃত্যুর দরুণ, যে বাড়ীতে এখন তাহারা আছে সে বাড়ীতে থাকা আর তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আয়ে কুলাইবে না। পরিতোষের ছোট বাড়ীটা ত খালিই পড়িয়া আছে। কিছু কম ভাড়ায় হইলে তাহারা কয়েকটা মাস এখানে থাকিতে পারে।

কম ভাড়ায় কথাটা লেখার মধ্যে হয়ত একটু আত্মপ্রতরণা ছিল। অনুপমা হয়ত জানিত যে পরিতোষ যদি রাজী হইয়া চিঠির জবাব দেয় তাহা হইলে ভাড়া সে লইবে না। কিন্তু এটুকুর বেশী আত্মপ্রতারণা যদি কোথাও থাকে তাহা হইলে তাহা অনুপমার অজ্ঞাত।

পরিতোষ আদৌ জবাব দিবে কিনা সে বিষয়ে একটু সন্দেহ অবশ্য ছিল। স্বামীর মৃত্যু ত হইয়াছে সাত বৎসর। এই সাত বৎসর আর কোন সম্বন্ধ দূরের কথা, খোঁজ খবরও নাই। পরিতোষ ভুলিয়া না গেলেও আর নতুন করিয়া পরিচয়ের সূত্রপাত করিতে নাও চাহিতে পারে।

কিন্তু পরিতোষ জবাব দিয়াছে। অবশ্য ম্যানেজারকে দিয়া চিঠিটা সে না লিখাইলেই পারিত। এটুকু তাচ্ছিল্যের মতই দেখায়। কিম্বা—অনুপমার হঠাৎ একটা কথা মনে হইয়া একটু কৌতুকও হইয়াছে—তাচ্ছিল্যের মত দেখাইবার চেষ্টাও হইতে পারে।

বাড়ীতে আশ্রয় দিবার প্রস্তাব করিয়া ম্যানেজারকে দিয়া চিঠি লেখান একটু অদ্ভুত বই কি! নিজের বাড়ীতে থাকিতে দিবার প্রস্তাবের জন্য ম্যানেজারকে দিয়া চিঠি লিখাইতে হইয়াছে—এমনও ত হইতে পারে!

কিন্তু তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। আপাততঃ অনুপমা এ প্রস্তাবে রাজী হইয়াছে। কয়টা মাস বইত নয়! একটা আশ্রয় পাওয়া লইয়া কথা!

কিন্তু কয়দিন বাদে আশ্রয় পাওয়াটাই একমাত্র কথা বলিয়া কি জানি কেন মনে হইল না।

কয়দিন ম্যানেজারই আসিয়া খোঁজ খবর লইতেছে।

"পরিতোষবাবু বলে পাঠালেন—আপনাদের মাঝের ঘরের ফ্যানটা মেরামত হতে গেছে, আপাততঃ একটা টেব্‌ল ফ্যান পাঠিয়ে দিলে…"

অনুপমা ম্যানেজারের সামনে বাহির হয়। সে হাসিয়া বলিয়াছে,—"আপনি বলুন গিয়ে ফ্যান আমাদের দরকার নেই। আমরা ফ্যান ত আগেও ব্যবহার করতাম না।"

ম্যানেজার সঙ্কুচিতভাবে বলিয়াছে,—"না, না, সে কি হয়!"

বিস্ময়সূচক আপত্তিটা, আগে ফ্যান না ব্যবহার করার কথায়, না ফ্যান দরকার নাই বলায় বোঝা যায় না। কিন্তু অনুপমার এই লইয়া কথা কাটাকাটি করিতে ভাল লাগে না, তাহাতে যেন সত্যই ব্যাপারটা লজ্জাকর হইয়া ওঠে। অনুগ্রহকে অন্য একটা অশোভন রূপ দিবার ইচ্ছা তাহার নাই।

সে বলিয়াছে,—"আচ্ছা তা'হলে পাঠিয়েই দেবেন।"

ম্যানেজার আবার আসিয়াছে পরের দিন খোঁজ লইতে;—"পরিতোষবাবু বলে পাঠালেন…"

অনুপমা কথার মাঝখানেই বাধা দিয়া হাসিয়া বলিয়াছে,—"আপনার পরিতোষবাবু রোজ রোজ বলে পাঠান কেন? নিজে একদিন এলেই ত পারেন। এমন কিছু দূরও ত নয়!"

কথাটা এমনভাবে বলিয়া ফেলিবে অনুপমা নিজেও ভাবে নাই, বলিবার ইচ্ছা ছিল না। বিশেষ ম্যানেজারের কাছে। সরকারমশাই লোকটি অমনিই কি ভাবে কে জানে? চতুর সাবধানী লোক! মুখে তাহার কোন ভাবান্তর হয় না, কিন্তু অনুপমাকে এতখানি সম্মানের সহিত এমন ভাবে আশ্রয় দেওয়ায় কোন কৌতূহল কি তাহার জাগে না? জাগে নিশ্চয়। মনে মনে কি যে একটা গড়িয়া লইয়াছে কে জানে! কথাটা অমন ফস্ করিয়া মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে অনুপমা নিজেই জানিত না। সে নিজেই অবাক হইয়াছে।

কিন্তু ম্যানেজার যে উত্তর দিয়াছে তাহাতে সে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে।

"পরিতোষবাবুর যে অসুখ!"

অনুপমার কোন উত্তর না পাইয়া যে কথাটা বলিতে আসিয়াছিল তাহাই ম্যানেজার আবার জানাইয়াছে;—

"তিনি বলে পাঠালেন—খোকাকে একটু বেড়াতে যেতে দিতে পারেন রোজ! আমাদের চাকর এসে বিকেলে নিয়ে যাবে কি?"

অনুপমা ঘাড় নাড়িয়া বুঝি সায় দিয়াছে।

ম্যানেজার চলিয়া যাইবার পর মনে পড়িয়াছে, কি অসুখ সে কথাটা জিজ্ঞাসাই করা হয় নাই। করা উচিত ছিল।

দুইভাগে ভাগ করা একই বাড়ী। ভিতরের দোতালায় বারান্দার একটা দরজা খুলিয়া দিলে অনায়াসে যাতায়াত করা যায়। প্রথম দিন আসিয়া দরজাটা তাহাদের দিক হইতে বন্ধ দেখিয়া অনুপমা খুশীই হইয়াছে। এক বাড়ীতে বাস করিতে হইলেও সে কথাটা স্মরণ রাখিবার কোন অস্বস্তিকর প্রয়োজন থাকিবে না।

দুপুরবেলা কি খেয়ালে ছেলেটিকে লইয়া অনুপমা নিজেই সে দরজা খুলিয়া ওদিকে প্রবেশ করিয়াছে।

দোতালার লম্বা রেলিঙ্‌ দেওয়া বারান্দা চারিদিকের ঘরগুলির সামনে দিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। সমস্ত বাড়ী নিস্তব্ধ। একটা চাকর বাকরের দেখাও নাই।

ঘরগুলির পরিচয় না জানিয়া অনুপমা আগাইয়া গিয়াছে। পরিতোষের ঘর খুঁজিয়া লইতেও অবশ্য তাহার বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু দ্বিধা আসিয়াছে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া। মনে হইয়াছে এমন ভাবে না আসিলেও চলিত! সরকার মশাইকে দিয়া খবর দিয়া বিকালে আসিলে কিছু ক্ষতি ছিল না।

অসুখের খবর শুনিয়া অন্ততঃ কৃতজ্ঞতার দরুণই না দেখিতে আসাটা অবশ্য অন্যায়। কিন্তু খানিকক্ষণ অপেক্ষা তাহার জন্য করা চলিত বোধ হয়।

কিন্তু এখন আর ফিরিয়া যাওয়াও চলে না। পথে চাকর বাকরের সঙ্গে দেখা হইতে পারে। তাহারা হয়ত পরে পরিতোষকে জানাইতে পারে! তখন কথাটা ভাল শুনাইবে না।

অনুপমা দরজায় ঘা দিয়াছে আস্তে।

কাহারও সাড়া পাওয়া যায় নাই। অনুপমা চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়াছে। এখনও কোথাও কোনও লোকজনের দেখা নাই। এখনও সে ফিরিয়া গেলে পারে। আবার ঘা দিবে কিনা সে বিষয়ে তাহার সত্যই দ্বিধা জাগিয়াছে।

ভয় তাহার মনে সত্যই একটু আছে। সারা সকাল সে বিষয়ে একেবারে কিছু না ভাবিয়া সে পারে নাই। পরিতোষ যদি সত্যই পুরাতন দিনের কথা তোলে। আশ্রয় চাহিয়া চিঠি লেখার সময় এসব কথাকে সে আমল দেয় নাই। পরিতোষ ম্যানেজারের মারফৎ জানান। প্রস্তাবে রাজী হওয়ার সময়ও মনের অস্ফুট দ্বিধাকে তাচ্ছিল্য করিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। সে কোন্‌ অতীত যুগের কথা। কত স্মৃতির স্তর তাহার উপর জমিয়া আছে। পরিতোষ শিক্ষিত ভদ্রলোক। সেই অতীত যদি তাহার কাছে এখনো জীবন্ত হইয়া থাকে তবুও সে নিশ্চয় তাহাকে পুরাতন পৃষ্ঠা হইতে টানিয়া বাহির করিবে না। সেটুকু সংযম ও সুরুচি নিশ্চয় তাহার আছে, ইহাই অনুপমা ভাবিয়াছে।

কিন্তু এখন মনে হয়, সংযমের ও সুরুচির পালিশ আর মানুষের কতটুকু গভীর! পালিশ ভেদ করিয়া অনাবৃত মূর্তি কি আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না!

পরিতোষ এখন তাহাকে নিজের হাতের মুঠায় পাইয়াছে বলিলেই হয়। নিজে হইতে দেখা করিতে আসিয়া সে আরো তাহাকে সুবিধা দিয়াছে।

এখন যদি পরিতোষ ঠিক শোভনতার সীমা না মানিয়া চলে। সহসা যদি বলিয়া বসে,—"এ বাড়ীতে ত তোমার অনেকদিন আগে আসবার কথা অনু! সেই এলে, কিন্তু তখন যদি আসতে?"

পরিতোষ সেদিন একটু উদ্দামই ছিল, সে উদ্দামতা এখনও তাহার আছে কি! যদি সে বলিয়া বসে,—"সেদিনের কথা মনে পড়ে অনু, স্টীমার ট্রিপ থেকে ফেরবার পথে যেদিন তোমায় নামতে দিতে চাইনি, বলেছিলাম সবাই নেমে গেলে একেবারে নিয়ে চলে যাব! খোঁজ পাবে না কেউ! সেদিন যদি সত্যি ধরে রাখতাম! তা'হলে আমাকে এমন করে জীবন কাটাতে হ'ত না! তোমাকেও এমন ভাবে আশ্রয় নিতে আসতে হ'ত না!"

উত্তর অবশ্য অনু তৈয়ার করিয়াই আসিয়াছে—প্রথমে এইটুকুই বলিলে চলিবে,—"ওসব কথা আর কেন!"

তবু যদি পরিতোষ না থামিতে চায়, যদি তখনকার মত উত্তেজিত হইয়া ওঠে, বলে,—"ওসব কথা আর কেন!—বেশ, ওসব কথাকে ভদ্রভাবে চেপে রাখতে হবে, কেমন? ভেতরে পুড়ে যদি খাক্ হয়ে যায় ওপরের পালিশ ঠিক থাকা চাই! ভদ্রতার শোভনতার দোহাই মেনেই তোমায় হারিয়েছি, আজও তাই মেনে চুপ করে শিষ্ট-সভ্য অভিনয় করে যেতে হবে! কেন, কেন,—বলতে পারো?"

এসব চিন্তা এমন গুছাইয়া তাহার মন হইতে কেমন করিয়া বাহির হইতেছে জানিতে পারিলে অনুপমা নিজেই একটু চমকাইয়া উঠিত না-কি! কিন্তু সে তাহা জানে না বোধ হয়।

পরিতোষের অশান্ত উচ্ছ্বাসের জবাবে সে একটু কঠিনই হইবে ঠিক করিয়া রাখিয়াছে—শান্ত কণ্ঠে অথচ দৃঢ় স্বরে বলিবে,—"তোমার ঘরে কি এইসব শুনতে এসেছি মনে কর!"

পরিতোষ তাহাতেও না থামিতে পারে। তখনকার দিনে সব সময়ে নিজেকে সে সংবরণ করিতে পারিত না। নিজেই বলিত,—"আমাদের রক্তের ধারা একটু

আলাদা অনু, চারিধারে পুকুর ডোবাই দেখে আসছ, আমাকে তারই মাফ্‌সই মনে কোরো না। আমাদের বংশে পা গুণে গুণে কেউ চলেনি। হঠাৎ এমন একটা কিছু করে বসতে পারি, যা তোমার বেড়া দেওয়া গণ্ডিকাটা জগতের ধারণা চুরমার করে দেবে।"

সেদিন অবশ্য সে তেমন কিছু করে নাই। তাহার স্বামীর সামনেই শুধু একদিন হাসিয়া বলিয়াছিল,—"একসঙ্গে একদিন কবে স্কুলে পড়েছিলে বলে খুব সুবিধেটা পেয়ে গেলে বিনয়। বন্ধুত্ব তোমার সঙ্গে কোনদিন এমন কিছু গভীর ছিল না, কিন্তু তারই নামে আমার হাত পা বাঁধা হয়ে রইল।"

স্বামী বুঝি খুব খানিকটা হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—"চিরকাল সমান পাগল রয়ে গেলে।"

পরিতোষ গম্ভীরভাবে বলিয়াছে,—"পাগল হতে আর পারলাম কই।"

তারপর বুঝি অদ্ভুতভাবে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছে,—"তুমি আমায় এখানে এমন রোজ আসতে দাও কেন বলত বিনয়। তোমার মনে কি সত্যি কিছু হয় না? অনুর সঙ্গে আমার পরিচয়টা কিরকম ছিল তুমি ভালরকমই জান। ওর কথার ওপর রাগ ক'রে ওকে অপমান ক'রে অমন নির্বোধের মত অতদিন সরে না থাকলে, তোমার আজ এখানে স্থান হবার কথা নয়, তবু তুমি আমায় বিশ্বাস করে আসতে দাও। তোমার বন্ধুত্বের লোভে যে আসিনা তা ত বোঝ।"

বিনয় হাসিয়া বলিয়াছে,—"তোমায় আমি চিনি যে।"

পরিতোষ অদ্ভুত মুখভঙ্গী করিয়া বলিয়াছে,—"হুঁ তোমার চেনাই রয়ে গেলাম।"

আজ পরিতোষ সত্যই অসংযত হইয়া উঠিতে পারে। বলিতে পারে,—"শুনতে আসনি বলেই শুনতে হবে না মনে করছ কেন? চিরদিন আমি নিঃশব্দে মুখ বুজে থাকব এমন ধারণা আমিই গড়ে তুলেছি, আজ আমিই ভেঙে দেব। তোমার ধারণা মত ভাল হয়ে বঞ্চিতই হয়েছি। আজ খারাপ হতে বাধা কি! আজ তোমার এই আসাটাকে আমি যদি নিজের মত মানে করে নিই অনু! সেইমত আয়োজনই যে করেছি তা কি বোঝনি। তুমি চাইবামাত্র সাগ্রহে

তোমায় ডেকে এনেছি, অন্য কোথাও নয় নিজের বাড়ীতে স্থান দিয়েছি—সে কি শুধু আমার উদারতা আর মহত্ত্ব মনে কর অনু ?

অনু বলিবে,—"আমি তাইত মনে করতে চাই।"

"না অনু, নিজেকে ভুল বুঝিও না। আর তোমার নিজেরও কি কোন কিছু বোঝবার নেই! কোন ভুল তোমার সংশোধন করবার, কোন অন্যায়ের প্রতিকার করবার! কোনখানে আজ ত তার বাধা নেই অনু! আজ যদি আবার আমি তোমায় চাই।"

অনুপমা এ পরিণতির কথাও ভাবিয়া রাখিয়াছে। প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে ইহার জন্যও।

ছেলেটিকে সে এবার পরিতোষের দিকে আগাইয়া দিবে। বলিবে,—"ভালো করে চেয়ে দেখো, নিজেকে তুমি ভুলে যাচ্ছ!"

না, ইহার পর আর বোধহয় কিছু বলিবার প্রয়োজন থাকিবে না। অনুপমা, ছেলের মাথায় হাত রাখিয়া নূতন করিয়া সাহস পায়।

দরজায় এবার একটু জোরেই সে ঘা দিয়াছে। ভিতর হইতে পরিতোষই সাড়া দিয়াছে,—"কে ?"

তাহার চাকরবাকর এ-রকম দরজায় ঘা দিয়া বোধ হয় ঘরে প্রবেশ করে না।

অনুপমা এবার দরজা খুলিয়া ভিতরে ঢুকিতে দ্বিধা করে নাই।

পরিতোষ ইজিচেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় কি একটা বই পড়িতেছিল। প্রথমে খানিকক্ষণ সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকিয়া তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে—স্মিতমুখে।

"আমায় এটা খুব বেশী লজ্জা দিলে! আমারই যাওয়া উচিত ছিল আগে!"

"না না, তোমার অসুখ শুনলাম!" অনুপমা নিজেই একটি শোফায় বসিয়াছে,—"আমি জানতাম না!"

"অসুখ! না, অসুখ এমন কিছু নয়, তবে কদিন একটু নড়াচড়া ঘোরাফেরা বারণ।"

হাসিয়া তাহার পর বলিয়াছে,—"পুরানো একটা ব্যাথা আছে বহুদিনের সঙ্গী;

মাঝে মাঝে চাড়া দেয়। তখন একটু জব্দ হয়ে থাকতে হয়!—খোকা এত বড় হয়েছে!"

কথাগুলা যে বাহিরের আবরণ মাত্র তাহা দু'জনেই বুঝি জানে। দু'জনেই পরস্পরকে লক্ষ্য করিতেছে, বিচার, বিশ্লেষণ, তুলনা করিয়া দেখিতেছে সবিস্ময়ে! সহজ আলাপের একটা পর্দা শুধু উপরে ফেলা।

বিস্ময়ের কারণ আছে বই কি! অনুপমা ঠিক পরিতোষকে এ-রকম দেখিতে আশা করে নাই। পরিতোষকে বুঝি তাহার চিনিতেই একটু কষ্ট হইতেছে! উপর হইতে দেখিলে চেহারায় এমন কিছু পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু কোথায় যেন অভাব ঘটিয়াছে—কিসের তাহা অনুপমা বুঝিতে পারে না। পরিতোষের গলার স্বর, কথার ভঙ্গিতে পর্যন্ত তাহার ইঙ্গিত আছে অথচ ঠিক ধরা যায় না।

পরিতোষ আবার বলিয়াছে,—"তুমি ত বিশেষ কিছু বদলাও নি।"

অনুপমা কথার মোড় ফিরিবার সম্ভাবনায় এবার নিজেকে সংযত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু না, কোন কিছু ঘটে নাই।

পরিতোষ অন্য কথায় ফিরিয়া গিয়া বলিয়াছে,—"তোমাদের কোন কষ্ট হচ্ছে না ত!"

"না কষ্ট কিসের! কষ্ট করেও কটা মাস যেখানে হোক থাকতে হ'ত। এত ভাল থাকবার আশাই ত করিনি।"

"কোথায় যাবে এরপর?"

"কোথায় আর। দেশের বাড়ীতে।"

"দেশে একটা বাড়ী আছে তোমার বাবার, না?" বলিয়া পরিতোষ কেমন অন্যমনস্ক হইয়া গেছে। এই অন্যমনস্কতাটা অনুপমা গোড়া হইতেই লক্ষ্য করিয়াছে। ঠিক বুঝিতে পারে নাই। এও কি একটা ভান! হৃদয়ের দুর্বার আবেগকে গোপন করিবার একটা ছল!

হঠাৎ তাহাদের সম্বন্ধে আবার সচেতন হইয়া পরিতোষ ছেলেটিকে কাছে ডাকিয়াছে,—"শোন এদিকে।" অনুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে,—"কি নাম রেখেছে ওর।"

"বাদল।"

"শোন বাদল। শুনে যাও।"

বাদল ভীত সঙ্কুচিতভাবে পরিতোষের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার মুখের দিকে খানিক তাকাইয়া থাকিয়া পরিতোষ বলিয়াছে,—"মুখ অনেকটা বিনয়ের মত, না?"

না, গলার স্বরে কোন কম্পন নাই, কোন রুদ্ধ আবেগের পরিচয়ও না।

অনুপমা মুখে হাসিয়া বলিয়াছে—"হ্যাঁ আছে একটু।" মনে মনে সে কি একটু বিস্মিত হইয়াছে।

বাদলকে পাশে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াই পরিতোষ আবার অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছে। পাশের বইটা একবার তুলিয়া লইতে গিয়া আবার রাখিয়া দিয়া বলিয়াছে,—"তোমাদের তাহলে কষ্ট হচ্ছে না কিছু,—হলে জানিও।"

"হ্যাঁ জানাব ম্যানেজারকে।"—অনুপমার কণ্ঠ কি একটু শুষ্ক!

পরিতোষ কোন উত্তর দেয় নাই। অনুপমা আবার বলিয়াছে,—"আচ্ছা আজ তাহলে উঠি।"

পরিতোষ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিয়াছে,—"আচ্ছা! একটু সারলেই আমি যাব একবার।"

অনুপমা আর কিছু বলে নাই। ছেলের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেছে।

দরজার বাহিরেই ম্যানেজার দাঁড়াইয়া ছিল কে জানিত। অনুপমা প্রথমতঃ একটু বিরক্তই হইল, ম্যানেজারের এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকার কি প্রয়োজন?

কিন্তু ম্যানেজারের প্রশ্নে যে বিস্মিত হইল।

"আপনি কি ভেতরে গেছলেন?"

কথা গুলা নয়, গলার স্বর ও মুখের ভাবই কেমন অদ্ভুত। অনুপমা বিরক্তি ভুলিয়া অবাক হইয়া বলিয়াছে,—"হ্যাঁ—কেন?"

"না কিছু নয়।"

অনুপমা কিন্তু তাহাতে আশ্বস্ত হয় নাই। ম্যানেজারের মুখের ভাবে একটা কি রহস্যের স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।

সে একটু রূঢ় ভাবেই বলিয়াছে,—"কিছু নিশ্চয়ই। কেন জিজ্ঞাসা করলেন, বলুন ?"

ম্যানেজার তাহার মুখের দিকে খানিকক্ষণ অদ্ভুতভাবে তাকাইয়া থাকিয়া বলিয়াছে,—"আপনি তাহলে বুঝতে পারেন নি।"

"কি বুঝব !"

"তাহলে বলছি, চলুন।"

ম্যানেজার তাহার সঙ্গে বারান্দার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গিয়া থামিয়াছে। তাহার পর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছে,—"আমি জানলে আপনাকে যেতে দিতাম না অমনভাবে। কখন কি বেঠিক বলে ফেলেন।"

"বেঠিক বলে ফেলেন !"—অনুর কাছে সমস্ত ব্যাপারটা এবার স্পষ্ট হইয়া উঠিতে দেরী হয় নাই।

"এরকম—?" তাহার প্রশ্ন সে শেষ করিতে পারে নাই।

"হ্যাঁ, এই এক বছর হয়েছে। অনেক সময়ে ঠিক থাকেন, আবার এক এক সময়ে সামলান শক্ত হয়। কিছু বেঠিক এখন বলেন নি ত ?"

না বেঠিক কিছু পরিতোষ বলে নাই; অনুপমার সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। এরূপ অবস্থাতেও পরিতোষ তাহার সহিত একেবারে সাধারণ ভাবে ব্যবহার করিয়াছে। তাহার সম্ভ্রমের মর্যাদা সে রাখিয়াছে। মনের উপর কোন শাসন যখন নাই তখনও তাহার মুখ হইতে কোন বেফাঁস কথা বাহির হয় নাই, কোন আভাস পাওয়া যায় নাই—উদ্বেল অতীত স্মৃতির।

অনুপমার মুখ নিজের পরিত্রাণের আনন্দেই বুঝি ছাইয়ের মত শাদা হইয়া গিয়াছে।

যাহা কিছু সে কল্পনা করিয়া ভীত হইয়াছিল, সম্বন্ধের যে জটীলতা, অতীত

জীবনের জের টানিবার যে সম্ভাবনা—সে বিষয়ে এবার সমস্ত দুর্ভাবনা হইতে সে মুক্ত।

নিশ্চিন্তভাবে এবার সে ক'টা মাস কাটাইয়া দিতে পারে।

কিন্তু মাঝের দরজা খুলিয়া নিজের ঘরের দিকে যাইতে যাইতে অনুপমার আর এক দণ্ড এখানে থাকিতে ইচ্ছা ক'রে না কেন? কেন পরিতোষের এই দুর্ভাগ্যে সমবেদনার চেয়ে আর একটি অনুভূতি তাহার বড় হইয়া ওঠে।

অমীমাংসিত

চোরের মত পা টিপিয়া প্রকাশ সিঁড়ি দিয়া উঠিল অনেক রাত্রে। নীচে সিঁড়ির আলো নেবানো হইয়াছে তাহার ঘরের আলো কিন্তু জ্বালা। অপর্ণা এখনও তাহা হইলে ঘুমায় নাই ; না, ঘুমাইবার কথা তাহার ত নয়, অন্ততঃ আজ সে যে জাগিয়া থাকিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

সে আশা করিয়া প্রকাশ অবশ্য এত রাত করে নাই। সে জানে আজ অপর্ণার সামনা সামনি তাহাকে দাঁড়াইতেই হইবে। অপর্ণা কোন দিন বেশী কথা বলে না, বেশী কথা চেষ্টা করিয়াও সে কোন দিন বলাইতে পারে নাই। আজও সে ভর্ৎসনায় অসংযত হইয়া উঠিবে না নিশ্চয়, কিন্তু কি সে করিবে? কি সে করিতে পারে? এই অনিশ্চয়তাই প্রকাশের কাছে দুঃসহ। অপর্ণা রাগারাগি কাঁদাকাঁদি করিবে জানিলে সে অনেক নিশ্চিন্তভাবে বুঝি বহু আগেই ফিরিতে পারিত! এই জন্যই এতক্ষণ ধরিয়া জোর করিয়া সে বন্ধুর বাড়ী কাটাইয়াছে। যাই যাই করিয়াও পা তাহার ওঠে নাই কেন সে জানে না। মিছামিছি সে সময় কাটাইয়াছে। সময় কাটাইবার কোন অর্থই যে হয় না তাহা সে ভাল করিয়াই জানে। বাড়ী সেই ফিরিতেই হইবে, অপর্ণার সামনে না দাঁড়াইলেও নয়, তবু সে গড়িমসি করিয়াছে।

বন্ধু প্রকাশকে জানে, সে ঠাট্টা করিয়াছে,—"আজকে তিনি বাপের বাড়ী—না ঝগড়া হয়েছে!"

প্রকাশ খুব জোরে হাসিয়াছে—"তোমাদের বুঝি ঝগড়া হ'লে এই ব্যবস্থা হয়?

বন্ধু বলিয়াছে,—"আমাদের এ ব্যবস্থা ত নতুন নয়, নিত্যনৈমিত্তিক। বউ-এর আঁচল ধরে আমরা ত সন্ধ্যে হতেই বসে থাকি না।"

প্রকাশ আবার হাসিয়াছে। এ অপবাদ তাহার নামে আছে, কিন্তু তাহাতে সে দুঃখিত কোন দিন হয় নাই। দুর্বলতা বলিয়া যে ভাবে, ভাবুক. সে ইহাকে

লজ্জার কিছু বলিয়া মনে করে না। এ দিক দিয়া প্রকাশকে আধুনিক গল্পের নায়ক হইবার অনুপযুক্ত বলিয়া মনে করা যাইত, গভীরভাবে ইহার মূল কথা না জানিলে। কিন্তু শুধু স্ত্রীর ব্যাপারেই নয় সব ব্যাপারে চিরদিনই তাহার স্বভাব এমনি। ভাসাভাসা ভাবে কিছু সে করিতে পারে না, সে একেবারে তলাইয়া যায়। সম্পূর্ণভাবে নিজেকে হারাইয়া ফেলাই তাহার প্রকৃতি। জীবনে এই জাতের লোক আঘাত পায় বুঝি সব চেয়ে বেশী, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে সামলাইয়া উঠিবার অন্তর্নিহিত শক্তিও তাহাদের অসাধারণ।

বন্ধুর কথার জবাবে প্রকাশ বলিয়াছে,—"এক-আধ-দিন তোমাদের বিরক্ত করতেও ত আসতে হয়।"

কিন্তু তবু কত রাত আর এমনভাবে কাটান যায়! এক সময়ে তাহাকে বাহির হইয়া পড়িতে হইয়াছে।

পথে আসিতে আসিতে সে কতরকম ভাবেই নিজেকে প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। পথে আসিতেই বা কেন, সারাদিনই ত সে অপর্ণার সঙ্গে দেখাশুনার সময় কি করিবে সেই ভূমিকার নানাভাবে মনে মনে মহড়া দিয়াছে। কিন্তু কিছুতেই স্বস্তি পায় নাই। শেষ পর্যন্ত দুর্বলের মত ব্যাপারটা সে স্থগিত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে যতক্ষণ পারা যায়।

এ দুর্বলতা বই আর কি! নিজেকেই সে বুঝাইয়াছে,—এ দুর্বলতা জয় করা উচিত। লোকে শুনিলে সত্যই হাসিবে। দুপুরে আফিসে বসিয়া একবার ভাবিয়াছে, কি হয় একান্ত সহজভাবে মুখে জোর করিয়া হাসি টানিয়া ঘরে ঢুকিলে।

অপর্ণা হয়ত সবে স্নানের ঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া আয়নার সামনে প্রসাধনে রত।

একবার একটু ঘাড় ফিরাইয়া তাহার দিকে তাকাইবে।

হ্যাটটা র‍্যাকের উপর রাখিয়া কোটটা ছাড়িয়া সহজভাবে তাহার পর চেয়ারে বসিয়া জুতাটা খুলিতে খুলিতে সহজ একটা ঠাট্টা করা যায়!

অপর্ণা হাসিবে না নিশ্চয়। কিন্তু সেটুকু লক্ষ্য না করিলেই হইল। জুতা ও

মোজা খুলিয়া ফেলিয়া চাকরকে একটু গম্ভীর স্বরে হাঁক দেওয়া,—"গরম জল দে বাথরুমে।"

তখন খানিকটা স্বগতভাবেই বলা যায়,—"সারাদিন শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে। ঠাণ্ডাও লেগেছে বেশ। আর ঠাণ্ডা জলটা গায়ে দেব না।"

অপর্ণার প্রসাধন ততক্ষণে শেষ হইতে পারে। সে নিজে হইতে কিছু নিশ্চয় বলিবে না। তখন ধরাচূড়া ছাড়া শেষ করিয়া বাথরুমে যাইতে যাইতে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া ফেলা……

কিন্তু ইহার বেশী কল্পনা আর অগ্রসর হইতে চাহে না। বলিয়া ফেলা ত সহজ, কিন্তু বলিবে কি ?

নিতান্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে,—"সকালে আমার অফিসের ফাইলগুলো তুমি যখন সরিয়েছিলে…"—এইভাবে কথাটা পাড়া যায়।

না; সে হয় না। তাহাতে নিজেকে শুধু ধরা দেওয়াই হইবে না, কথাগুলো নিতান্ত নীচুদরের চাতুর্যের মত শুনাইবে। অপর্ণার নীলাভ, গভীর আয়ত চোখ তাহা ক্ষমা করিবে না—সেই ঈষৎ করুণ, ঈষৎ ক্লান্ত চোখে কি ছায়া যে ভাসিয়া উঠিবে কে জানে !

প্রকাশ তাই ভাবিয়াই অস্বস্তি বোধ করে।

একবার ভাবিয়াছে—সোজাসুজি গিয়া অপর্ণাকে ডাকিয়া কাছে বসাইবে, স্বীকার করিবে সমস্ত কথা, বলিবে,—"আমার কথা না শুনে বিচার করোনা, দোহাই তোমার !"

অপর্ণা কি মুখ ফিরাইয়া থাকিবে !

থাকুক ! সে তবু বলিয়া যাইবে,—"তুমি সব দেখেছ জানি। আমার লুকোবার কিছু নেই, লুকোতে আমি চাই না। কিন্তু ওগুলো আমাদের অফিসের ফাইলের তলায় যেমন হারিয়েছিল এতদিন, আমার মনেও তেমনি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ওগুলোত নষ্ট করে ফেলতেও পারতাম কিন্তু তা যে করবার কথা ভাবিনি, তাতেই বুঝবে…"

না, প্রকাশ আবার অন্যভাবে ভূমিকা তৈয়ারী করিয়াছে। দৃঢ় সবল

পদক্ষেপে অপর্ণার কাছে গিয়া দাঁড়াইবে। কাঁধ দুটি একটু কঠিন ভাবেই ধরিয়া তাহার দিকে ফিরাইয়া চিবুকের নীচে হাত দিয়া মুখটি তাহার দিকে তুলিয়া ধরিবে।

"আমার দিকে সোজাভাবে তাকাও! কি মনে হয় তোমার? কি ভেবেছ আমায়? অত্যন্ত পাষণ্ড, অত্যন্ত নোংরা একটা মানুষ,—কেমন? ঠিক করে ফেলেছ বোধ হয়, যার জীবনে এমন গোপন ব্যাপার থাকে, যে সে কথা আবার গোপন করতে পারে, তার সঙ্গে সম্বন্ধের কোন সূক্ষ্ম মাধুর্য আর থাকতে পারে না, কোন পবিত্রতা আর নয়!"

"বেশ! তাই ঠিক করে ফেল! আমার কথা শুনতে চেওনা; আমারও যে বলবার কিছু থাকতে পারে তা ভেবো না! এতদিন আমায় যা জেনেছো তা শুধু ওই টুকুর জন্য মিথ্যে হয়ে যাক!"—শেষের দিকে স্বর বেশ তীব্র হইয়া উঠিবে।

কিন্তু সংশয় তবু যায় কই! এতদিনের পরিচয়, বাস্তবিকই মিথ্যা হইয়া যাইতে পারে। তাই যদি হয়? না, সে কথা প্রকাশ ভাবিতে পারে না।

তাছাড়া সে জানে, অপর্ণার সঙ্গে অমনভাবে কথা বলা যায় না, অপর্ণাকে জোর করিয়া চাহিতে বলিলে ত হইবে না। সেই ঈষৎ ক্লান্ত ঈষৎ করুণ দৃষ্টি সে নিজেই তুলিয়া ধরিবে তাহার মুখে। প্রকাশের সমস্ত কথা কি তাহাতেই স্তব্ধ হইয়া যাইবে না?

সত্যই, সে দৃষ্টি তাহার কাছে এখনও দুর্জ্ঞেয়; বুঝি দৃষ্টির সেই অস্ফুট বিষণ্নতার সহিত পাতলা ঠোঁট দুটির ঈষৎ ব্যঙ্গের আভাস জড়িত ভঙ্গিমার অপরূপ অসামঞ্জস্যের দরুণ। অপর্ণার মুখ কোমল কিন্তু নিছক সারল্যের বর্ণহীন, কোমলতা সেখানে নাই; অপর্ণার দৃষ্টি শান্ত কিন্তু অতল হ্রদের মত, তাহার গভীরতায় যেন বহু যুগের বহু জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়া আছে। অপর্ণা কাছে বসিয়াও কোথায় যেন সুদূর।

নিজের স্ত্রীকে এমনভাবে দেখিয়া এত কবিত্ব কেহ করে না বোধ হয়! করিলে নাকি আজকাল ভাল শোনায় না! কিন্তু প্রকাশ তাহার স্ত্রীকে

ভালোবাসে, সত্যই যেমন করিয়া পুরুষ ভালো বাসিতে পারে নিজেকে একেবারে হারাইয়া ফেলিয়া। সুলভ সঙ্গিনীরূপে কাছে পাইয়া সে দুর্লভ প্রিয়াকে হারায় নাই।

সেই জন্যই তাহার আজ এত অস্থিরতা, উদ্বেগ, অনুশোচনা। সে জানে যে, তাহার সমস্ত স্বর্গ ভাঙ্গিয়া যাইতে বসিয়াছে,—সব স্বপ্ন, সব আশা। এ আঘাতে যাহা ভাঙ্গিল কোনমতে আর তাহা ঠিকমত জোড়া দেওয়া যাইবে না, যে সূত্র ছিঁড়িয়া গেল, হাজার গ্রন্থি দিয়াও তাহাকে আগের মত অখণ্ড করা অসম্ভব। তাহাদের উভয়ের মধ্যে চিরন্তন একটি কণ্টকের ব্যবধান রচিত হইয়া গেল। মানুষ ভুলিয়া যায় সব কিছুই—একথা সে জানে, কিন্তু সে কথায় সান্ত্বনা কোথায়?

অথচ কি ভাবেই এই একবছর তাহার কাটিয়াছে! তাহাদের আনন্দোজ্জ্বল নির্মেঘ আকাশে কোথাও এতটুকু দুর্ভাবনার বাষ্প পর্যন্ত ছিল না। অপর্ণা একটু বুঝি নিজের মধ্যে গুটাইয়া থাকিতে ভালোবাসে, কিন্তু প্রকাশ নিজের উৎসাহের আতিশয্য দিয়া তাহার অভাব পূরণ করিয়া লইয়াছে। প্রত্যেক মুহূর্ত একটা স্বপ্ন, প্রত্যেক সাক্ষাৎ একটা বিস্ময়।

প্রকাশ নিজের মুখেই বলিয়াছে,—"তুমি কাছে বসে থাকলেও অমন করে চেয়ে থাকি কেন জান?"

অপর্ণা বলিয়াছে,—"আমি সুন্দর বলে,—এই কথা বলবে ত?"

"না না, তা নয় শুধু, প্রত্যেক বার তোমায় দেখে আমার মনে হয় আগে যেন ঠিক ভালো করে তোমায় দেখিনি, হঠাৎ নতুন দিক থেকে তুমি যেন দেখা দিলে! তোমায় বিয়ে করেছি ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই।"

"সে আমিও যাই!" বলিয়া একটু হাসিয়া অপর্ণা হয়ত উঠিয়া গিয়াছে।

প্রকাশ কোনদিন হয়ত বলিয়াছে,—"আচ্ছা, তোমার সঙ্গে বিয়ে যদি আমার না হ'ত!"

সেই পাতলা ঠোঁটের বঙ্কিমা বুঝি আর একটু স্পষ্ট হইয়াছে।—"তাহলে আরেক জনের সঙ্গে হ'ত?"

"সে কিন্তু আমি ভাবতে পারি না!"

"ভেবে এখন আর কোন লাভ নেই!"

"না ঠাট্টা নয়, তোমার সঙ্গে বিয়ে যদি না হ'ত, অথচ হঠাৎ একদিন কোথাও যদি তোমায় দেখতে পেতাম!"

"অভদ্রের মত চেয়ে থাকতে তাহলে?"

প্রকাশ হাসিয়া বলিয়াছে,—"তাত থাকতামই, আরও কিছু করতাম বোধ হয়।"

"উঁহুঃ, তাতে সুবিধে হ'ত না, আইন কানুন বড্ড কড়া!"

দু'জনেই এবার হাসিয়াছে। প্রকাশ বলিয়াছে,—"আমায় বোধ হয় তুমি লক্ষ্যই করতে না, কেমন?"

"না করারইত কথা! সেইটেই শোভন হ'ত না কি?"

প্রকাশ কথার সুরে আবার হাসিয়াছে!

সত্যই সে দিনগুলি প্রকাশের নেশার মত কাটিয়াছে। তেমনি ভাবেই চিরদিন কাটাইতে সে চায়।

এমন সামান্য একটু ত্রুটির জন্য সামান্য একটু ভুলের দরুণ, স্বপ্নের মত সে দিন মিলাইয়া যাইবে এ চিন্তাও অসহ্য!

অনায়াসে চিঠিগুলি কবে সে পুড়াইয়া ফেলিতে ত পারিত! ড্রয়ারের মধ্যে তাহার অফিসের ফাইলের তলায় সেগুলি যে চাপা আছে, তাহা যে সত্যই ভুলিয়া গিয়াছিল,—এগুলি যত্ন করিয়া সে রাখিয়া দেয় নাই, বিবাহের পর একদিন ফেলিয়া দিবে বলিয়াই ঠিক করিয়াছিল, তাহার পর সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হইয়াছে। তাহার জীবনে আজ সত্যই এগুলির কোন চিহ্ন নাই।

কিন্তু সেগুলি পড়িয়া অপর্ণা, তাহা বুঝিবে কি? বোঝা সম্ভব ত নয়। সে চিঠির ভাষা, আবেগ, বর্ণনা সমস্তই তাহার বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরভাবে সাক্ষ্য দিবে। একদিন অমন জটিল সম্বন্ধ-জালে যাহার সহিত জড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহার স্মৃতি পর্যন্ত যে জীবন হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছে এ কথা কে বিশ্বাস করিবে! প্রকাশ নিজেই হয় ত অপরের বেলায় তাহা করিত না কিন্তু তবু এ কথা যে একান্তভাবে সত্য! প্রকাশ নিজেই অবাক হইয়া যায়!

কোন দাগ ত তাহার মনে নাই। সে সব যেন আর এক জীবন, অন্য কাহারও জীবনের কাহিনী। বই-এ পড়া কোন গল্পের মত সে সব দিন তাহার কাছে অস্পষ্ট সুদূর হইয়া গেছে। একদিন সে যে এমন করিয়া তলাইয়া গিয়াছিল সে-দিনকার আঘাত বেদনা আনন্দ অত সত্য ছিল তাহার জীবনে, তাহা ভাবিতে তাহার বিস্ময় লাগে! তাহার প্রকৃতিই বুঝি এই, কিন্তু সে কথা কে বুঝিবে?

অপর্ণা নিশ্চয়ই নয়! চিঠিগুলি হইতে কি চিত্র সে যে গড়িয়া তুলিবে তাহা কল্পনা করা কঠিন নয়। সমস্ত জটিলতা, সমস্ত গ্লানি সমেত প্রকাশের অতীত জীবনের একটি অধ্যায় যে ভাবে তাহাতে ফুটিয়া উঠিবে তাহা প্রেমের মূল বিশ্বাসের ভিত্তি দৃঢ় করিতে সাহায্য নিশ্চয়ই করিবে না! গ্লানি? হ্যাঁ গ্লানিও সে জীবনে ছিল বই কি! সামাজিক অনুশাসনের মর্যাদা সেদিন ঠিক রক্ষা ত করে নাই। সে দিন সে কথা মনেও হয় নাই। না, সে সব কথা ভাবিতেও ভালো লাগে না। প্রকাশের প্রথম পরিচয়ের সময়ে অপর্ণাকে সব কথা খুলিয়া বলা কি উচিত ছিল? না। বলে নাই বলিয়া আজও প্রকাশ দুঃখিত নয়, সে ধরণের নির্বুদ্ধিতার প্রতি তাহার কোন মোহ নাই। তাছাড়া জীবনের যে পরিচ্ছেদ সত্যই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহাকে অকারণে স্মৃতির স্তর খুঁড়িয়া বাহির করায় মূঢ়তা ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ পায় না।

কিন্তু কি আকস্মিকভাবেই ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল। আফিসের তখন বেলা হইয়া গিয়াছে! প্রকাশ খাইতে বসিয়া হঠাৎ বলিয়াছে,—"ওই যাঃ ভুল হয়ে গেছে! একটা কাজ কর লক্ষ্মীটি! আমার ড্রয়ারটা খোল গিয়ে, প্রথমেই গোটা দুই ফাইল পাবে—তার নীচে একটা ছোট নোট বই আছে, নীল মলাট; সেইটে আমার 'ফোলিও ব্যাগে' ভরে রাখো'গে। রোজ নিয়ে যেতে ভুল হয়ে যাচ্ছে—এখন মনে পড়েছে, আবার যাবার সময় হয়ত ভুলে যাবো!"

খাওয়ার পর ঘরে ঢুকিয়া খোলা দেরাজের দিকে চাহিয়া প্রকাশ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে! এমন ভাবে দৈব তাহার বিরুদ্ধে বাদ সাধিতে পারে ইহা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

দেরাজের উপর খোলা চিঠিগুলা ইতস্ততভাবে ছড়ান। যে রেশমের সূতা দিয়া সেগুলা বাঁধা ছিল সেটা ধারে পড়িয়া আছে। খামহীন খোলা চিঠি! লেখাগুলি অস্পষ্টও নয়। দূর হইতে দাঁড়াইয়াই চেষ্টা করিলে তাহার কয়েক ছত্র বেশ পড়া যায়। আর কিছু পড়িবার প্রয়োজন নাই, শুধু সম্বোধনটুকুই তাহাদের পরিচয় জ্ঞাপন করিয়া কৌতূহল জাগ্রত করিবার পক্ষে যথেষ্ট।

ড্রয়ারের তলা হইতে যাহার হাতে এ-লেখাগুলি বাহির হইয়া আসিয়াছে, চেষ্টা করিলেও সে বুঝি এগুলি না লক্ষ্য করিয়া পারে না।

প্রকাশ শঙ্কিত ব্যাকুলভাবে ঘরের চারিদিকে তাকাইয়াছে। না, অপর্ণা কোথাও নাই। তাহার পর আর কিছু ভাবিবার অবসর নিজেকে সে দেয় নাই সমস্ত চিন্তা তাহার গুলাইয়া গিয়াছে শুধু এইটুকু সে বুঝিয়াছে অস্পষ্টভাবে যে, এই অবস্থায় সে অপর্ণার সম্মুখীন হইতে পারে না।

তাড়াতাড়ি চিঠিগুলা কোনমতে ড্রয়ারের তলাতেই রাখিয়া দিয়া 'ফোলিও ব্যাগ' লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। অপর্ণার সহিত দেখা এখন কিছুতেই যেন না হয়। অপর্ণা হয়ত নিজেই এই অপ্রত্যাশিত নিদারুণ আঘাতের পর তাহার সামনে আসতে চাহে না। না আসুক, তাহাকে পূর্বেই বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। এই মুহূর্তে সমস্ত চিন্তায় তাহার জট পাকাইয়া গিয়াছে। অপর্ণার সম্মুখে দাঁড়ানো এখন অসম্ভব। একবার বাহির হইবার পর একটু সামলাইয়া লইয়া, ধীরে-সুস্থে তাহাকে একটা কিছু ভাবিয়া ঠিক করিতে হইবে।

কিন্তু ঠিক আর সমস্ত দিনেও হয় নাই, কোন কিছুই সে ভাবিয়া পায় নাই। কোন লুকোচুরি মিথ্যা-ভাষণের কথা অবশ্য সে ভাবিতেও পারে না। অস্বীকার করিয়া ব্যাপারটা উড়াইয়া দিবার কোন কল্পনাই তাহার নাই। কিন্তু কেমন করিয়া সে ঘরে গিয়া দাঁড়াইবে, কি বলিবে অপর্ণাকে?

জীবনের সমস্ত মাধুর্য যাহাতে বিনষ্ট হইতে বসিয়াছে—সে বিপদ সে কেমন করিয়া ঠেকাইবে? অপর্ণাকে সে যতটুকু জানে—নিঃশব্দে ভুলিয়া যাইবার পাত্রী

সে নয়। অপর্ণা কেন, আর কেহও তাহা পারিত না। কিন্তু ভাবিবার অবসর আর নাই।

সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া সে দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছে। দরজাটা ভেজানই আছে হাত দিয়া ঠেলিবার আগেই ভিতর হইতেই দরজাটা খুলিয়া যায়। অপর্ণাই খুলিয়াছে!

"এত দেরী হল যে?"

সবিস্ময়ে মনের সমস্ত উদ্বেগ উত্তেজনা প্রাণপণে দমন করিবার চেষ্টা করিয়া অপর্ণার মুখ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে লক্ষ্য করিয়া দেখে।

আশ্চর্য! নিতান্ত স্বাভাবিক সে মুখ! তবে কি—? না, এতটা সৌভাগ্য কল্পনা করার সাহস এখনও তার নাই।

অপর্ণা আবার বলে,—"গেছলে কোথায়?"

প্রকাশ আবার সন্দিগ্ধভাবে তাহার দিকে তাকায়, না—কোন পরিবর্তন সে মুখে নাই!

জড়াইয়া জড়াইয়া সে যেমন-তেমন একটা উত্তর দেয়—অনেক দিনের বন্ধু রাস্তায় ধরাধরি করিয়া লইয়া গেল, কিছুতেই ছাড়িল না—ইত্যাদি।

খেয়ে আসনি ত! এখানে কিন্তু সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।"

প্রকাশ যেন বিমূঢ় হইয়া গেছে। এও কি সম্ভব? না, এখনও নিজের এরকম সৌভাগ্য বিশ্বাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না যে! এমনও কি হইতে পারে যে, অপর্ণা ফাইলগুলি ঘাঁটিবার সময় চিঠিগুলি বাহির হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে নিজে কিছুই পড়ে নাই।

কিন্তু তাছাড়া এ আচরণের আর কোন অর্থ ত হইতে পারে না! তাহা না হইলে কোথাও এতটুকু পরিবর্তন তাহার মুখের—নিশ্চয় চোখে পড়িত।

সমস্ত দিনের নিদারুণ উদ্বেগের পর নিশ্চিন্ততার এই অপ্রত্যাশিত স্বাদ, মুক্তির এ আনন্দও দুঃসহ। প্রকাশ বুঝি নিজের বুকের উল্লাস গোপন করিতে পারিবে না।

উৎসাহভরে হঠাৎ সে বলিয়া ফেলে,—"না খাইয়ে আবার ছাড়ে! আজ আর ও নাম করোনা! তুমি খাওনি ত?"

"তোমার আগে কি আমার খেতে আছে?"

প্রকাশ হাসিয়া বলে,—"নেই, কে বলেছে, আর খেতে নেই বলেই খাওনা নাকি?"

"তাই বল্লেই বা দোষ কি!" বলিয়া অপর্ণা হাসিয়া বাহির হইয়া যায়। প্রকাশ পোষাক-পরিবর্তন করিবার আয়োজন করে।

অনিশ্চয়তার দুঃসহ যন্ত্রণা তাহার গিয়াছে। কিন্তু এখনও সে বিমূঢ়! ব্যাপারটা সে ভালো করিয়া এখনও উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না।

রাত্রে বিছানায় শুইয়াও প্রথমে তাহার ঘুম আসিতে চায় না, অপর্ণা অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, নির্বিকার শান্ত মুখ। ঘুমের মধ্যেও শুধু ঠোঁটের কোণের বঙ্কিমায় ক্ষীণ যেন একটু রহস্যের রেখা! মিছামিছি কি উদ্বেগেই সারাদিন তাহার কাটিয়াছে ভাবিয়া, এখন হাসি পায়! অপর্ণা কিছুইত জানে না, কিছুই সে মনে করে নাই।

কিন্তু মিছামিছিই বা কেন? অপর্ণা যে এমনভাবে চিঠিগুলা সামনে থাকিতেও চাহিয়া দেখিবে না—একি কেহ ভাবিতে পারে?

ভাবা যায় কি? প্রকাশের মনে বিদ্যুৎচকিত অস্পষ্ট একটা চিন্তার আভাস খেলিয়া যায়। সে নিজেই সচকিত হইয়া ওঠে।

সত্যই কি তাহা ভাবা যায়? কিন্তু তাহা না হইলে—কী তাহাকে বুঝিতে হইবে? চারিধারে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া আসিয়াছে, বিদ্যুৎচকিত যে সম্ভাবনার ইঙ্গিত তাহার মধ্যে খেলিয়া যায়, তাহাকে স্পষ্ট না করিয়া তুলিবার জন্য প্রকাশ প্রাণপণে নিজের অজ্ঞাতে বৃথা চেষ্টা করে।

অপর্ণা নির্বিকার, অপর্ণা অবিচলিত; সবকিছু জানিয়া-শুনিয়াও সে উদাসীন—এও কি হইতে পারে?

প্রকাশ বিছানায় উঠিয়া বসে! অপর্ণা হয়ত সবই পড়িয়া দেখিয়াছে, সব কথাই সে জানে—তবু কিছুই তাহাকে স্পর্শ করে নাই। এমন একটা ব্যাপারও তাহার মনে কোন রেখাপাত করে না, তাহার জীবনে প্রকাশের স্থান এতই সামান্য!

প্রকাশের মনের ভিতর দিয়া অপর্ণার সহিত বিবাহিত জীবনের ইতিহাস নূতন আলোকে দ্রুতগতিতে ভাসিয়া যায়। অপর্ণার সমস্ত আচরণ—সমস্ত কথারই নূতন অর্থ যেন তাহাতে ফুটিয়া উঠিতেছে!

অপর্ণা কি চিরদিনই সুদূর নয়! প্রকাশ তাহার নিজের আবেগ-ব্যাকুলতার আতিশয্যেই কি চিরদিন সে দূরত্ব সম্বন্ধে অচেতন ছিল না?

এ নিদারুণ সন্দেহের কেমন করিয়া মীমাংসা হইবে?। মীমাংসার কোন উপায়ই যে নাই! চিরদিন মৌন থাকিয়া এ সন্দেহের অবিরাম দাহনে তিলেতিলে দগ্ধ হইতে হইবে!

অপর্ণা গভীর আঘাত পাইয়াছে মনে করিয়া তাহার সমস্ত দিন উৎকণ্ঠিত ও বেদনা-জর্জর হইয়া গেছে, অপর্ণা কোন আঘাত পায় নাই সন্দেহ করিয়া তাহার সমস্ত জীবন যে বিষাক্ত হইয়া গেল!

নিশাচর

দশ বৎসর আগে বাঙ্গালার দু'টি স্বামী-স্ত্রীর সাধারণ একটি দাম্পত্য কলহের যে নিদারুণ পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল, তাহার কথাই বলি।

বাড়ীটি তেমন ভালো নয়—অত্যন্ত জীর্ণ। সংস্কার অভাবে তাহার চারিধারের দেওয়াল নানা জায়গাতেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সে ভাঙ্গা দেওয়ালের ফাঁক দিয়া সুদূর নীল পাহাড় আর শালের জঙ্গল যখন চোখে পড়ে, তখন তাহার জন্য কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয়।

ছোট খড়ের ছাউনি দেওয়া বাড়িটির সঙ্কীর্ণ বারান্দায় দাঁড়াইয়া কতদিন অমলা দূরের নীলপাহাড়শ্রেণীর দিকে চাহিয়া আর চোখ ফিরাইতে পারে নাই। এমনটি আর সে কখন দেখে নাই। বাঙ্গালার সমতল আগাছা-আচ্ছন্ন পল্লীর সে মেয়ে। পৃথিবী যে এত বিশাল, এমন সুন্দর এ ধারণাই তাহার ছিল না। কাজ করিতে করিতে দিনে অন্ততঃ একশতবার সে বারান্দায় খানিকক্ষণের জন্য দাঁড়াইয়া দূরের পাহাড়ের দিকে চাহিয়া থাকে। স্বামীকে অন্ততঃ একশতবার দিনে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া সেই এক কথাই বলে,—"ভারী সুন্দর দেশ, না গা?"

বিভূতিভূষণের অত উৎসাহ নাই। সে শুধু সংক্ষেপে 'হুঁ' বলিয়া সায় দেয়। পৃথিবীর সৌন্দর্য দেখিয়া তারিফ করিবার তাহার সময় নাই। তাহাকে অনেক কিছু ভাবিতে হয়। এক মাসের ছুটি মঞ্জুর হইয়াছে, তাও আধা মাহিনায়। ছুটি ফুরাইলে আরেকটা দরখাস্ত করিতে হইবে; কিন্তু মনিবেরা আর গ্রাহ্য করিবে বলিয়া মনে হয় না। অথচ অমলা এক মাসে কিই বা এমন সারিবে। দিন কুড়ি হইয়া গেল, তবু নিয়মিত জ্বর ত এখনও আসিতেছে। তিন মাসের কমে এখানকার জল ভালো করিয়া গায়েই বসে না। কিন্তু তিন মাস ছুটি যদি বা মিলে এখানকার খরচ কুলাইবে কেমন করিয়া? সাহস করিয়া ভগবান ভরসা করিয়া সে রুগ্না স্ত্রীকে লইয়া চেঞ্জে আসিয়াছে, কিন্তু সাহসেরও একটা সীমা আছে।

চেঞ্জের জায়গা হিসাবে বাড়ীটির ভাড়া অত্যন্ত অল্পই বটে, কিন্তু সেই অল্পই যে তাহার কাছে দুর্বহ বোঝা।

অমলা ইতিমধ্যে আর একটা কি মন্তব্য করে, সে শুনিতে পায় না।

অমলা একটু গলা চড়াইয়া বলে,—"হাঁ গা, কালা হয়েছ না কি! অত কি ভাবছ বল দেখি?"

বিভূতি একটু অসহিষ্ণু হইয়া বলে,—"তোমার ও একঘেয়ে এ সুন্দর তা সুন্দর শুনতে আর ভালো লাগে না বাপু! সুন্দর দেখে ত আর পেট ভরবে না।"

অমলা উচ্ছ্বাসের মধ্যে বাধা পাইয়া লজ্জিত হইয়া ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণও হয়। স্বামীর ভাবনা যে কি তাহা সে জানে না, এমন নয়, কিন্তু স্বামী নিজেই তাহাকে বারবার সকল ভাবনা ত্যাগ করিতে বলিয়াছে। চেঞ্জে আসার কথায় খরচের কথা ভাবিয়া সে আপত্তি করিয়াছিল; কিন্তু স্বামী নানাভাবে বুঝাইয়া তাহার সে আপত্তি দূর করিয়াছে। সে সম্বন্ধে কোন কথা পাড়িলে স্বামী বলিয়াছে,—"ভাবনা-টাবনা ছেড়ে তুমি শুধু তাড়াতাড়ি সেরে ওঠবার চেষ্টা কর দেখি।"

প্রথম প্রথম তাহাদের কি সুখেই কাটিয়াছে। নূতন দেশের সৌন্দর্য বিস্ময় মুগ্ধ চোখে শুধু দেখিয়া নয়, পরস্পরকে বলিয়া যেন তারা ফুরাইতে পারে নাই। কিন্তু গত কয় দিন হইতে স্বামীর ভাব যেন কেমন বদলাইতে সুরু করিয়াছে। অমলার মনে হয়, অবশ্য দোষ তাহারই। চেঞ্জে আসিয়াও তাড়াতাড়ি না সারিয়া ওঠা তাহার অন্যায়! না সারিলে এত টাকা খরচ বৃথাই হইবে।

তবু স্বামীর এই বিরক্তি সে আশা করে নাই। মুখখানি ম্লান করিয়া সে ঘরের ভিতর চলিয়া যায়। ভাবে, স্বামীর এ বিরক্তি নিশ্চয়ই ক্ষণিকের; এখনি সে অনুতপ্ত হইয়া হয়ত ক্ষমা চাহিতে আসিবে। না রাগ করিয়া সে থাকিবে না; কিন্তু একটা মজা করিবে। শুধু সৌন্দর্য দেখিয়াই একদিন কে সব ভুলিত, পেট ভরাইবার জন্য ব্যস্ত হইত না, তাহাই স্মরণ করাইয়া দিবে।

কিন্তু অনেকক্ষণ কাটিয়া গেলেও বিভূতির আসিবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। অমলা রাগ করিবেনা ভাবিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় তাহার অভিমান হঠাৎ

প্রচণ্ড হইয়া ওঠে। অকারণে স্বামীর সামনে দিয়া দু'চারবার যাতায়াত করিয়া সে ঘরে আসিয়া হঠাৎ খিল দেয়।

"দরজায় খিল দিলে কেন গো! কি হ'ল আবার?"

অমলা সাড়া দেয় না। বিভূতি দু'চারবার কড়া নাড়ে, খুলিবার জন্য অনুরোধ করে, তাহার পর নিজে হইতেই বিরক্ত হয়। মেয়েদের কোন কাজের যুক্তি খোঁজার নিস্ফলতা সে অনেকদিন আগেই উপলব্ধি করিয়াছে।

খিল খুলিতে পেড়াপীড়ি করিলে বেশী দেরী হইবে একথা বুঝিয়া সে নীরবে খানিক বাদে নিজের কাজে চলিয়া যায়।

কিন্তু ঘণ্টাখানেক বাদেও ফিরিয়া আসিয়া দরজা বন্ধ দেখিয়া তাহার রাগ হয়। এতটা বাড়াবাড়ি কিসের জন্য। বিরক্ত হইয়া বলে,—"সন্ধ্যা হয়ে এল বেড়াতে যেতে হবে না? খিল দিয়ে ঘরে বসে থাকলেই শরীর সারবে না কি?"

এবার ভিতর হইতে অমলা উত্তর দেয়,—বেড়াইতে সে যাইবে না, এ পোড়ার শরীর তাহার চিতায় পুড়িলেই একেবারে সারিবে।

বিভূতির রাগ বাড়ে—কড়া নাড়িয়া উচ্চস্বরে বলে,—"ও সব ন্যাকামি রেখে তাড়াতাড়ি সাজপোষাক শেষ ক'রে ফেল দিকি! অন্ধকার ত হয়ে গেল, আর বেড়াবার সময় কই?"

অমলা তথাপি দরজা খোলে না। তাহার অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ শোনা যায়,—"আমি হয়েছি তোমার আপদ-বালাই, মরলেই তোমার হাড় জুড়োয়। উঠতে-বসতে দাঁত খিচোবে যদি, তা' হলে চেঞ্জে আসবার দরকার ছিল কি! কি হবে আমার শরীর সেরে?"

বিভূতির আর সহ্য হয় না। "বেশ কাঁদ তা' হ'লে ঘরের ভেতর বিনিয়ে বিনিয়ে। আমি একাই যাচ্ছি বেড়াতে।"—বলিয়া রাগে সে বাহির হইয়া যায়।

বেড়াইতে অবশ্য তাহার ভালো লাগে না। বাড়ীর অদূরে একটা পাথরের উপর বসিয়া মেয়ে জাতটার এই অবুঝ অভিমানের কথাই সে ভাবে। এত রাগারাগি করিবার মত কি কথা সে বলিয়াছে, আর যদি একটা রূঢ় কথা বাহির হইয়াই গিয়া থাকে, তাহার জন্য কি সন্ধ্যাটা মাটি করিতে হয় এমন করিয়া? আর

ক'টা দিনই বা আছে। এখানের প্রত্যেকটি দিন যে তাহাকে কি মূল্যে কিনিতে হইয়াছে সে ভালো করিয়াই জানে। এই ক'টি দিনের উপর সে ভরসা করিয়া আছে। অমলার জ্বর সারান চাই-ই তাহার ভিতর। এই মূল্যবান দিনের একটি নষ্ট হইয়া গেল ভাবিয়া দুঃখের আর সীমা থাকে না। কে জানে কতটা উপকার এই দিনটিতেই হইতে পারিত। হয়ত কাল আর জ্বর আসিত না!

অমলা ঘর হইতে বাহির হইয়াছে। বেড়াইতে না যাক্ উনুন ধরাইয়া রান্না চড়াইতে সে ভোলে নাই। বিভূতির রাগ পড়িয়া তখন ক্ষোভ আসিয়াছে। কাছে গিয়া সে অত্যন্ত স্নেহের স্বরে বলে,—"মিছিমিছি রাগ ক'রে আজ বেড়ানটা কেন নষ্ট করলে বল দেখি। তুমি ভারী অবুঝ।"

অমলা কিন্তু ফোঁস করিয়া তিক্তকণ্ঠে জবাব দেয়,—"যাও, আর সোহাগ জানাতে হবে না। নিজে বেড়িয়ে এসেছ ত তা'হলেই হ'ল।"

বিভূতি আঘাত পাইয়াও হাসিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলে,—"বাবারে, এখনও রাগ যায় নি তোমার! তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, লক্ষ্মীটী, রাগ করে শরীরের ক্ষতি এমন করতে আছে!"

অমলা রাগিয়া বলে,—"আমার ভালো ত তুমি খুব চাও। চেঞ্জে আনতে টাকা খরচ হয়েছে বলে বুক টন্‌টন্ করছে; উঠতে-বসতে মুখনাড়া দিচ্ছ তাই।"

অন্যদিন হইলে ইহার চেয়ে অনেক বেশীই হয়ত বিভূতি সহ্য করিত। হয়ত আর একবার মান ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিলেই সব গোলমাল মিটিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু আজ তাহার হঠাৎ আবার রাগ চড়িয়া যায়; উষ্ণস্বরে বলে,—"তোমার জন্যে টাকা খরচ হয়েছে ব'লে আমার বুক টনটন করছে, বটে?"

"করছেই ত।"

বিভূতি গলা চড়াইয়া বলে,—"করবে নাই বা কেন! টাকা রোজগার করতে মেহনৎ হয় না? অমনি আসে? চেঞ্জে এসে ঘরে খিল দিয়ে থাকবে ত টাকা খরচ করবার কি দরকার ছিল?"

"আমি তোমায় চেঞ্জে আনতে ত সাধিনি।"

বিভূতি সে কথায় কান না দিয়া ধরাগলায় বলিয়া যায়,—"বিয়ে হওয়া ইস্তক

ত জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারলে! মরবে ত জানি, তা' সোজাসুজি আগে থাকতে মরলে ত আর আমায় এত ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় না।"

অমলা সবেগে স্বামীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়ায়,—"আমার জন্যে তোমায় ঝঞ্ঝাট পোহাতে হচ্ছে?"

অন্ধকারে বিভূতি মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, উত্তর দেয় না।

স্বামীর দিকে চাহিয়া খানিক নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অমলা রুদ্ধকণ্ঠে বলে,—"বেশ, আজই তোমার সব ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে দিচ্ছি।"

অন্ধকারে অমলা খোলা দরজা দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া যায়। বিভূতি আগাইয়া ধরিতে গিয়াও বোধ হয় কি ভাবিয়া আবার ফিরিয়া বসিয়া পড়ে। অমলা ছেলেবেলা হইতে ভয়কাতর সে জানে। রাগ করিয়া বাহির হইয়া গেলেও বেশীক্ষণ সে থাকিতে পারিবে না। এখনি ফিরিবে।

কিন্তু একটু একটু করিয়া অনেকক্ষণ কাটিয়া যায়। তবু অমলা ফেরে না। বিভূতি এবার ভীত হইয়া উঠে। দরজার কাছে আগাইয়া গিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া মৃদুস্বরে ডাকে,—"অমলা।" কোন সাড়া-শব্দ নাই। বিভূতি আরো জোরে স্ত্রীর নাম ধরিয়া ডাকে। তবু কোন উত্তর মিলে না। এক অজানিত আশঙ্কায় তাহার বুক কাঁপিয়া উঠে। ঘরে আসিয়া লণ্ঠনটা জ্বালিয়া লইয়া সে দ্রুতপদে অমলাকে খুঁজিতে বাহির হইয়া যায়।

নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রি। তাহারই মাঝে সুদূর পথে থাকিয়া থাকিয়া বিভূতি-ভূষণের ব্যাকুল কাতর আহ্বান শোনা যায়,—"অমলা!"

ঘাটশীলার স্টেশনে বসিয়া গভীর এক অন্ধকার রাত্রে আমরা বিভূতি ও অমলার দাম্পত্য কলহের এই কাহিনীটি শুনিয়াছিলাম। কেমন করিয়া কি অবস্থায় শুনিয়াছিলাম, তাহার বিবরণ বড় অদ্ভুত।

ছিলাম চক্রধরপুরে। হঠাৎ রমেশের খেয়াল হইল অন্ধকার রাত্রে মোটরে করিয়া গেলুডিতে গিয়া বিভাসকে চমৎকৃত করিয়া দিতে হইবে। আগের দিন

সকালবেলা বিভাসের বাড়ী হইতেই তিনজনে মোটরে করিয়া চক্রধরপুরে রওনা হইয়াছিলাম। হঠাৎ পরের দিন গভীর রাত্রে তাহার দরজায় গিয়া ডাক দিলে বিস্মিত হইবার কথা। শুধু বিভাসকে চমকাইয়া দিবার জন্য এই রাত্রে এতখানি পথ যাইবার তেমন স্পৃহা আমার বা বীরেনের কাহারও ছিল না, কিন্তু রমেশের উৎসাহ দমাইয়া রাখা কঠিন। শেষ পর্যন্ত তাহার প্রস্তাবে রাজীই হইতে হইল। গোল বাধিল শুধু সোফারকে লইয়া। স্পষ্ট না বলিলেও ভাবে বোঝা গেল এই অন্ধকার রাত্রে মোটর হাঁকাইয়া যাইতে তাহার বিশেষ আপত্তি আছে। সে সম্বন্ধে সবিশেষ প্রশ্ন করিয়া মনে হইল, ভয়টা তাহার পার্থিব কোন প্রাণী বা দ্রব্য-বিশেষের জন্য নয়—তাহার ভয় ভৌতিক। এ পথে রাত্রে মোটর চালান না কি মোটেই নিরাপদ নয়।

কিন্তু তাহার কোন আপত্তিই রমেশ টিকিতে দিল না। সন্ধ্যার খানিক বাদেই রওনা হইয়া পড়িলাম। পরিষ্কার সোজা পথ। গাঢ় অন্ধকারের ভিতর দিয়া আমাদের প্রখর হেডলাইট সে পথ ভেদ করিয়া চলিয়াছে—মনে হয় যেন অন্ধকারের ভিতর হইতে আমাদের আলোয় পথ প্রতি মুহূর্তে আমরা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছি। যে বেগে মোটর চলিতেছিল, তাহাতে পৌছিতে অতিরিক্ত দেরী হইবার কথা নয়।

রমেশ পা-টা সামনের সীটের উপর তুলিয়া দিয়া আরামে মাথা হেলান দিয়া বলিল,—"কি আরাম বল দেখি। অন্ধকার রাত্রে মোটর চালাবার মত মজা আছে, বিশেষতঃ এমনি পথে!"

বীরেন বলিল,—"কিন্তু কি ভয়ঙ্কর অন্ধকার বল দেখি? মনে হয় যেন আমাদের হেডলাইটকে সবলে ঠেলে এগুতে হচ্ছে।"

রমেশ কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলা হইল না। হঠাৎ সার্চ লাইটটা নিবিয়া গেল; আর সেই মুহূর্তে মনে হইল,—আমাদের চারিধারে অন্ধকার যেন ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল, আলো নিবিতে না নিবিতে একেবারে সবেগে আসিয়া ঘিরিয়া ধরিল।

বীরেন বলিল,—"একি?"

সোফার গাড়ী থামাইয়া নামিয়া বলিল,—"কি জানি বুঝতে পারছি না।" তার কণ্ঠস্বরে সম্মানের চেয়ে ভয় ও বিরক্তির পরিচয়ই বেশী পাইলাম।

দু'ধারে ঘন জঙ্গল; তাহার মাঝে সেই নির্জন পথে অন্ধকারে শুধু দেশলাইয়ের আলোক সম্বল করিয়া অনেকক্ষণ সোফার হেডলাইট জ্বালিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া অবশেষে বলিল,—"না, এ জ্বলবে না।"

"তা' হ'লে উপায়!"

সোফার বলিল,—"গাড়ীর অন্য আলো জ্বলবে মনে হচ্ছে, কিন্তু তাতে পথ ভালো দেখা যাবে না।"

রমেশ বলিল,—"তাই জ্বেলেই চল, এখান থেকে আর ফেরা যায় না।"

তাহাই হইল। মোটরের সে সামান্য আলোয় সে দুর্ভেদ্য অন্ধকার যতটুকু দূর করা যায় তাহাই করিয়া আবার অগ্রসর হইতে সুরু করিলাম। আলোর জোর নাই, সুতরাং গাড়ীর বেগ একটু কমাইয়াই চলিতে হইল।

বীরেন বলিল,—"পথ চিনে ঠিক যেতে পারবে ত?"

প্রশ্নটা সকলের মনেই উঠিয়াছিল। সোফার বলিল,—"তা, কেমন ক'রে বলি বাবু! একবার মাত্র ত এ পথে এসেছি, তাও দিনের বেলায়!"

তাহার গলার বিরক্তির স্বর এবার স্পষ্ট। কিন্তু তখন তাহা লক্ষ্য করিবার সময় নাই। ভীত-ভাবে বলিলাম,—"কিন্তু পথ ভুল হ'লে এই অজানা জায়গায় কি উপায় হবে বল ত?"

সোফার কথা বলিল না। মনে মনে রমেশের উপর রাগ হইতেছিল। গোঁয়ার্তুমী করিয়া অন্ধকার রাত্রে অজানা বিপদসঙ্কুল পথে এমন করিয়া তাহার জেদেই ত বাহির হইতে হইয়াছে।

বীরেন বলিল,—"ধর, যদি ইঞ্জিনটাই কোন রকমে খারাপ হয়ে যায়!" এবং এই সম্ভাবনা ভালো করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার আগেই আবার বলিল,—"এসব বনে বাঘ আছে জান ত?"

রমেশ আশ্বাস দিবার জন্য হাসিয়া বলিল,—"মোটর খারাপ হবে, এমন

আজগুবি কথা ভাবছই বা কেন!" কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরে মনে হইল, তাহার নিজের কথায় নিজেরই আস্থার একান্ত অভাব।

তাহার পর খানিক সবাই নীরবে চলিলাম। চারিদিকের নিস্তব্ধতা ও অন্ধকার আমাদের ছোট মোটরের শব্দ ও আলোয় আমরা ক্ষীণভাবে ভেদ করিয়া চলিয়াছি। পাশের গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ জঙ্গলের আবছা মূর্তি যেন এই উপদ্রবে প্রতিপদে ভ্রূকুটি করিতেছে মনে হইতেছিল। মোটরের সামান্য একটু বেয়াড়া শব্দেই বুক কাঁপিয়া উঠিতেছিল—এই বুঝি বন্ধ হইয়া যায়!

কিন্তু মোটর বন্ধ হওয়ার সমান বিপদই শেষ পর্যন্ত হইল। কত মাইল কতক্ষণ ধরিয়া তখন আসিয়াছি বলিতে পারি না। হঠাৎ একজায়গায় আসিয়া মোটর থামাইয়া সোফার বলিল,—"কিন্তু পথ যে সত্যি চিনতে পারছি না বাবু! ঠিক পথে এলে এতক্ষণ একজায়গায় রেল লাইন পার হবার কথা ব'লে মনে হচ্ছে।"

রমেশ বলিল,—"পার হয়ে আস নি দেখেছ ঠিক!"

"দেখেছি বই কি!"

ইহার পর আর কি করা হইবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। এখান হইতে আগান বা পিছান সমান বিপদ। এই অন্ধকার রাত্রে গহন জঙ্গলের মাঝে এদিক-ওদিক ঘুরিয়া যদি মাঝপথে পেট্রোল ফুরাইয়া যায়, তাহা হইলেই সর্বনাশ! কি করা উচিত ভাবিতেছি, এমন সময় বীরেন বলিল,—"রোসো রোসো—একটা আলো দেখা যাচ্ছে না? দেখ ত?"

সত্যি আলোই ত বটে। অদূরে কে একজন লণ্ঠন হাতে করিয়া আমাদের দিকেই আসিতেছে মনে হইল। কাছে আসিতে দেখিলাম, লোকটি আর যাহাই হোক প্রিয়দর্শন নয়। অন্ধকার রাতে তাহাকে হঠাৎ পথে দেখিলে আঁৎকাইয়া উঠিবার কথা। শীর্ণ দীর্ঘ দেহ, তাহার ঝাঁকড়া চুল সেই শীর্ণ মুখের উপর ফণার মত উঁচাইয়া আছে। হাড় বাহির করা মুখে সব চেয়ে অদ্ভুত তাহার কোটরনিবিষ্ট চোখ দু'টি। হঠাৎ মনে হয়ে বুঝি উন্মাদ। কিন্তু তখন অত বিচারের সময় ছিল না। জিজ্ঞাসা করিলাম'—"এই রাস্তায় কি গেলুডি যাওয়া যায় জান?"

লোকটার ধরণ-ধারণও অদ্ভুত। খানিক সে আমাদের কথায় কোন উত্তরই দিল না। হয় ত শুনিতে পায় নাই ভাবিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছি, এমন সময় অত্যন্ত গম্ভীরগলায় বলিল,—"এই পথই বটে।"

লোকটার কথার ধরণ দেখিয়া কিন্তু কেমন সন্দেহ হইল; বলিলাম,—"ঠিক জান ত!"

এতক্ষণ সে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের পর্যবেক্ষণ করিতেছিল, আমার কথায় হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,—"এইখানে বিশ বছর ধরে আছি, আর গেলুডির পথ জানি না।"

যাক্, হয় ত কথা তাহার সত্য। সোফার আবার গাড়ী ছাড়িয়া দিল। বলিলাম,—"যা হবার হয়ে গেছে, এখন চল সামনে যতদূর পথ মেলে।"

বহুক্ষণ—প্রায় ঘণ্টা দুয়েক হইবে—এইভাবে চলিবার পর একজায়গায় আসিয়া কিন্তু বিষম ঠেকিয়া গেলাম। সামনে পথ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। সোফার বলিল,—"কোন্‌টায় যাব বুঝতে ত পারছি না।"

এবার সমস্যা সত্যই দারুণ। দুইটা পথই যে ঠিক নয় এটুকু বুঝিবার জন্য বেশী বুদ্ধির দরকার নাই। কিন্তু কোন্ পথে যাওয়া যায়? গাড়ী থামাইয়া আমরা সেই তর্কই করিতেছি, এমন সময়ে বীরেন বলিল,—"না বিধাতা আমাদের সহায়। এই আরেকটা আলো দেখা যাচ্ছে!"

এবারেও একটা লোক আলো লইয়া আসিতেছিল বটে! বলিলাম,—"এই জঙ্গলের মাঝে মানুষ থাকতে পারে ভাবি নি—"

এবারের লোকটা কাছে আসিতে সোফারই তাহাকে পথ জিজ্ঞাসা করিল। লোকটা বিড়বিড় করিয়া কি তাহাকে বলিল শুনিতে ভাল পাইলাম না। কিন্তু সোফারকে তাড়াতাড়ি গাড়ী চালাইয়া দিতে দেখিয়া বুঝিলাম—সে এবার রাস্তা বুঝিয়াছে।

হঠাৎ বীরেন বলিল,—"দাঁড়াও দাঁড়াও, গাড়ী একটু থামাও ত।"

তাহার উত্তেজিত ভাব দেখিয়া সভয়ে বলিলাম,—"কেন!"

বীরেন কম্পিত গলায় বলিল,—"লোকটাকে লক্ষ্য করেছ তোমরা।" এবং

আমাদের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বলিল,—"প্রথম যে লোকটা আমাদের পথ বলে দেয় একেবারে হুবহু সেই লোক!"

ঠিক অমনি একটা সন্দেহ আমারও হইতেছিল, কিন্তু ভয় ধরা পড়িবার লজ্জায় বলিতে পারি নাই। বীরেনের কথায় সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল—যথাসাধ্য সাহস সংগ্রহ কষিবার চেষ্টা কয়িয়া বলিলাম,—"কিন্তু তাকে ত প্রায় বিশ মাইল দূরে ফেলে এসেছি।"

"সেই ত আশ্চর্য ব্যাপার! এই জনমানবহীন জঙ্গলের পথে দু'-দুবার মানুষের দেখা পাওয়াই অদ্ভুত ব্যাপার! তার উপর বিশ মাইল পার হয়ে সেই একই লোক!"

সোফার হঠাৎ গীয়ার বদলাইয়া দ্বিগুণবেগে গাড়ী ছাড়াইয়া দিল। বলিলাম, "ও কি করছ?"

সে তিক্তকণ্ঠে বলিল,—"কি করব বাবু, আমার প্রাণের ভয় নেই?"

বলিলাম,—"তুমিও দেখছ নাকি!"

সোফার পিছন না ফিরিয়াই ভীতস্বরে বলিল,—"দেখেই না অত তাড়াতাড়ি গাড়ী ছেড়ে দিলাম।"

পরমুহূর্তে আমরা সকলে একসঙ্গে হৈ হৈ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। সোফার প্রাণপণে ব্রেক কষিয়া গাড়ী রুখিতে গেল। গাড়ী থামিল না, ষ্টীয়ারিং হুইল ঘুরিয়া একেবারে পাক খাইয়া পাশের গড়ানে খাদ দিয়া হড়হড় করিয়া চলিল। সামনের দিকে চাহিয়া সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তেও দেখিতে পাইলাম গভীর জল তারার আলোয় সামান্য চিকচিক করিতেছে। বুঝিলাম, তাহার তলেই আমাদের সমাধি হইতে চলিয়াছে। ভয়ে চোখ বুজিলাম।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রক্ষা পাইলাম। সামনে বুঝি উঁচু একটা তারের জাল ছিল, তাহাতে গাড়ী আট্‌কাইয়া গেল। এ রকম অবস্থায় গাড়ী উল্টাইয়া যাইবার কথা, কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাহা যায় নাই। চোখ খুলিয়া দেখিলাম, প্রবল ঝাঁকানি খাইয়াও অক্ষত শরীরেই সবাই রক্ষা পাইয়াছি।

প্রথম কথা কহিল বীরেন; আতঙ্কের স্বরে বলিল,—"লোকটার একেবারে কি বুকের ওপর দিয়ে গাড়ী গেছে সোফার!"

সোফারের পায়ে আঘাত লাগিয়াছিল ; খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বাহির হইয়া বলিল,—"কি জানি বাবু, ব্রেক কষতে কষতেই গাড়ী ঘুরে গেছে। দেখবার সময় পাইনি।"

তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া বলিলাম,—"এখনই দেখতে হবে, চল।"

সবাই মিলিয়া উপরে উঠিয়া আসিলাম। কিন্তু আশ্চর্য! তন্ন তন্ন করিয়া চারিদিক খুঁজিয়াও কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। সামান্য কিছু নয়, একটা জোয়ান মানুষ ; সবাই মিলিয়া স্পষ্ট তাহাকে গাড়ীর ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া যাইতে দেখিয়াছি। তাহার দেহ এই এক মিনিটের ভিতর কোথায় উধাও হইয়া যাইতে পারে। যেদিকে খাদ সেদিকেও সে পড়ে নাই। পড়িয়াছে একেবারে সম্পূর্ণ অন্য দিকে—সেখান হইতে মৃত বা জীবন্ত কাহারও এক মিনিটে অন্তর্ধান হওয়া একেবারেই সম্ভব নয়।

বীরেন বলিল,—"তা' হ'লে কি?—"

তাহার কথা আর শেষ করিতে হইল না। একই নামহীন আতঙ্কে সবারই বুক কাঁপিতেছে। বলিলাম,—"ও মোটর আজ আর ওঠান যাবে না। চল, সবাই মিলে এগিয়ে যাই।"

রমেশ বলিল,—"কিন্তু কোথায়?"

বলিলাম—"ওই দূরে ক'টা লাল আলো দেখা যাচ্ছে, বোধ হচ্ছে যেন স্টেশন একটা হবে।"

বীরেন বলিল,—"কিন্তু আবার আলো?"

সেদিন অনেক হায়রাণীর পর অবশেষে স্টেশন পৌছাইয়াছিলাম। পথ ভুল যে কতখানি হইয়াছে স্টেশনের নাম দেখিয়াই বোঝা গেল। গেলুডি আসিতে একেবারে ঘাটশীলায় আসিয়াছি। গভীর রাত্রে স্টেশনে তখন একা টেলিগ্রাফ মাস্টারই জাগিয়াছিলেন। লোকটি অত্যন্ত ভদ্র। আমাদের সাদর অভ্যর্থনা করিয়া আশ্রয় দিয়া বলিলেন,—"আজকের রাতটা এখানে থাকুন, কাল আপনাদের মোটর তোলবার ব্যবস্থা করিয়ে দেব।"

ঘুমাইবার ব্যবস্থা একপ্রকার তিনি করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তখন আর ঘুমাইবার প্রবৃত্তি নাই। তাঁহাকে সমস্ত দুর্ঘটনার কাহিনীই বলিলাম।

ভদ্রলোক গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"আপনারা জানেন না তাই; নইলে এ অঞ্চলে সাহেব-সুবোরাও রাত্রে ও-পথে মোটর নিয়ে বেরোয় না! আপনারা তবু প্রাণে বেঁচেছেন। পাঁচ-ছটা মোটর লোকজন সমেত এই রাত্রে আশ্চর্যভাবে চুরমার হয়ে গেছে।"

সভয়ে বলিলাম,—"কিন্তু কি ব্যাপার মশাই?"

"শুনি মোটরের উপরই তার যত আক্রোশ! সারারাত না কি অমনি লণ্ঠন নিয়ে এই পথে ঘুরে বেড়ায়।"

ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কে?"

সীগ্ন্যালার মশাই ধীরে ধীরে বলিলেন,—"দশ বৎসর আগে এখানকার একটি লোক রাত্রে তার স্ত্রীকে খুঁজতে বেরিয়েছিল—আর বাড়ী ফেরে নি।"

তারপর একটু থামিয়া বলিলেন,—"ওই পথে সে মোটর চাপা পড়ে মারা যায়। তবে শুনুন···"

থার্মোফ্লাস্ক ও চীনের যুদ্ধ

সদ্য ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর চেতনা যখন ধীরে ধীরে সার্বাঙ্গে ছড়িয়ে যেতে থাকে তখনকার অবস্থাটা প্রশান্তর কাছে বিশেষ উপভোগ্য জিনিষ।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিজেকে যেন সে আবিষ্কার করতে থাকে সবিস্ময়ে,—এক এক ক'রে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তারপর অত্যন্ত কাছের আবেষ্টন, তারপর আরও জটিল, আরো বহুদূর প্রসারিত, বহু সম্পর্কে জড়িত সত্তা!

তার মনে হয়, বাঁচাটাও একটা আপেক্ষিক ব্যাপার, জেগে-ওঠা সচেতনতার নানা স্তরে ভাগ করা। সকলে সব স্তরে পৌছোয় না, সব সময়ে একই স্তরে থাকে না। ক্যামেরার লেন্‌সের মত সচেতনতার ক্ষেত্রও সীমাবদ্ধ, দূরের দিকে ফেরালে কাছের জিনিষ ঝাপসা হয়ে আসে। ক্যামেরা তবু অনন্ত লক্ষ্য ক'রে মোটামুটি সব কিছুই স্পষ্ট করতে পারে, আমাদের সচেতনতা তেমন নয়।

আজ কিন্তু প্রশান্ত এসব কিছু ভাবছে না। ঘুম তার এইমাত্র ভেঙেছে। চেতনার জোয়ার শরীর মনের প্রান্তে গিয়ে পৌছেছে। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে এতক্ষণ সে শেল্‌ফের উপর চটা-ওঠা তোবড়ান থার্মোফ্লাস্কটার দিকে চেয়েছিল বুঝে সে নিজেই অবাক হয়ে যায়।

সেদিন পর্যন্ত এরকম ত সে কখনও করেনি। চোখ গিয়ে পড়লেও সে ইচ্ছে করে ফিরিয়ে নিয়েছে। মনের এদিকের কপাট সে সযত্নে রেখেছে বন্ধ ক'রে—প্লাবনের জল রুদ্ধ করে রাখবার জন্যে এ যেন তার অবচেতন মনের বাঁধ। কিন্তু আজ হঠাৎ কি হ'ল! বাঁধের কপাট খোলা, তবু কিছুই ত ভেসে যায়নি দুর্বার বন্যায়!

অবশ্য থার্মোফ্লাস্কটা ছাড়া আরো অনেক কিছু সে লক্ষ্য করেছে। বিছানার ধারে 'টিপয়ে' চাকরে চা রেখে গেছে। তারই সঙ্গে খবরের কাগজ। চীনের ওপর জাপানের অত্যাচার সম্বন্ধে ছাপার হরফের তীব্র আর্তনাদ সেখানে সমস্ত

কাগজটার ওপর এমনভাবে বিস্তৃত যে লক্ষ্য না করে উপায় নেই। জাপানী উড়ো জাহাজের বোমায় বিধ্বস্ত চীনের নগরের খানিকটা বড় হরফে ছাপা বিবরণও বুঝি অন্যমনস্কভাবে সে পড়ে ফেলেছে, কিন্তু তবু তার দৃষ্টি যে বেশীর ভাগ থার্মোফ্লাস্কটার ওপরই ছিল একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

শুধু দৃষ্টি নয় তার চিন্তাও ওই থার্মোফ্লাস্ককে কেন্দ্র করে অনেক দূরে ঘুরে এসেছে—সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর। সেইটেই আশ্চর্য! এসব চিন্তাকেই ত সে এতদিন সাবধানে, সযত্নে দূরে ঠেলে রেখেছে। এত প্রবল ভাবাবেগে সে সমস্ত চিন্তা, সে সমস্ত স্মৃতি উদ্বেলিত যে একবার আমল দিলে আর সে থই পারে না, বাস্তবতার কঠিন আশ্রয়ে বাঁধা স্বাভাবিক সুস্থ বুদ্ধির নোঙরও তার উপড়ে যাবে, একথা সে জানত। তাই সে কবাট বন্ধ করে রেখেছে, মনের সুইচ কেটে দিয়েছে সামান্য একটু বিপদের আভাসে।

কিন্তু আজ অনায়াসে তার মন ত ঘুরে এল, সুদূর ও অতি নিকট সেই পাঁচ বৎসরের ওপর দিয়ে! কোথায় গেল সে দুঃসহ জ্বালা, বুক-ভেঙ্গে-দেওয়া যন্ত্রণা। স্মৃতির সামান্য একটু ছোঁয়ায় যে ক্ষত টনটনিয়ে উঠত তা যেন অসাড় হয়ে এসেছে। সূর্যাস্তের মেঘের মত ভাবাবেগের উজ্জ্বল আভা হারিয়ে স্মৃতি এখন বিবর্ণ। তার দিকে তাকাতে চোখ আর ঝলসে যায় না। তার রূপ আছে, রঙ নেই।

অথচ একদিন এই স্মৃতির কোন অবলম্বন না রাখবার জন্যেই সে সব চিহ্ন ব্যাকুলভাবে মুছে ফেলেছিল। কিছুই সে রাখেনি, একটা ছবি পর্যন্ত না। শুধু এই থার্মোফ্লাস্কটা কেমন করে আর ফেলে দেওয়া হয় নি। মাথার দিকে চোখের আড়ালে একটা রঙ-চটা টোল-খাওয়া পুরানো থার্মোফ্লাস্ক! সেটা ভুলেই থেকে গেছে, সেটাকে ভুলে থাকাও কঠিন হয় নি।

একটা রঙ-চটা পুরানো থার্মোফ্লাস্কও অবশ্য অনেক দূর নিয়ে যেতে পারে, —তিন বৎসর আগেকার সুদূর লক্ষ্ণৌ শহরের স্টেশনে।

শীত! হ্যাঁ তখন শীত বইকি। গাড়ীতে উঠেই মনে আছে সে জানলার কাঁচ তুলে দিতে চেয়েছিল। মায়া বলেছিল,—"না এখন থাক।"

"কিন্তু ভয়ানক ঠাণ্ডা, তুমি বুঝতে পারছ না! গাড়ী চলতে সুরু করলেই হাওয়ায় একেবারে জমে যাবে।"

"আমার কনকনে হাওয়া ভালো লাগে।"—বলে মায়া শুধু গায়ের আলোয়ানটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়েছিল।

প্রশান্ত একটু অপ্রসন্ন স্বরে বলেছিল,—"এদিকে ঠাণ্ডাও ত লাগে কথায় কথায়!"

"সেই ভয়ে জবুথবু হয়ে থাকতে পারব না।"

"বেশ! নিউমোনিয়া হলে কিন্তু জানি না।"

মায়া হেসেছিল—"তখন আমায় না হয় নামিয়ে দিও!"

"কোথায়?"—প্রশান্ত এবার পরিহাস করে বলেছিল—"এলাহাবাদে?"

মায়া তার দিকে অদ্ভুতভাবে খানিকক্ষণ চেয়েছিল নীরবে। শুধু আহত অভিমান নয়, সে দৃষ্টিতে তখনই বুঝি একটু দুর্বোধ রহস্যের ছায়া পড়েছে।

যেন অনেকক্ষণ বাদে নিজেকে সংযত করে মায়া বলেছিল,—"এলাহাবাদ হয়ে ত আমরা যাচ্ছি না!"

এই রকম উত্তরই প্রশান্তকে সবচেয়ে বিচলিত করেছে তখন। এরকম উত্তর সে চায় না, বুঝতে পারে না তার মানে। মায়া ত অনায়াসেই কথাটাকে পরিহাস হিসেবেই গ্রহণ করতে পারত। বলতে পারত অনায়াসে,—"হ্যাঁ তাই দিও।" কিন্তু মায়া তার ধার দিয়েও যায় না। এটা কি তার কাছে পরিহাসের জিনিষ নয় বলেই! প্রশান্তর অস্বস্তি তীব্র হয়ে উঠেছে।

তবু সে পরিহাসের সুর বজায় রেখে বলেছে,—"ভাগ্যিস্ যাচ্ছি না।"

তারপর মায়ার কাছে কোন উত্তর না পেয়ে বলেছে,—"জানলা যখন খুলে রাখবেই তখন একটু ওষুধের ব্যবস্থা করতে হয়।"

স্টেশনের 'স্টল' থেকে তখনই থার্মোফ্লাস্কটা সে কিনে এনেছিল—কিনে, ধুয়ে, গরম চা ভর্তি করে।

গাড়ী তখন ছাড়ে ছাড়ে। মায়া বলেছিল,—"এই জন্যে তুমি নেমে গেছলে? কি দরকার ছিল?"

"দরকার খানিক বাদেই টের পাবে—ছু' একবার হাঁচি সুরু হোক্ না!"

"কত নিলে শুনি?"

"তা বেশ নিলে,—তিন টাকা!"

তিন টাকা! মায়া বিরক্ত হয়ে ভৎর্সনা করে উঠেছিল,—"তিন টাকা দিয়ে তুমি এইটে কিনতে গেলে! বাজারে যে ছু' টাকার কমে পাওয়া যায়!"

"কিন্তু এটা ত বাজার নয়, স্টেশন, এবং বাড়ী নয়, আমরা ট্রেণের যাত্রী!"

মায়া ব্যাপারটাকে তবু উড়িয়ে দিতে পারে নি। একটা টাকা অকারণে লোকসান ক'রে আসবার জন্যে অনেকক্ষণ ধরে ভৎর্সনা করেছে।

এখানেও মায়া ছুর্বোধ্য। তুচ্ছ লাভ লোকসানের হিসাব সম্বন্ধে তার এই ব্যাকুলতায় প্রশান্ত আগেও অবাক হয়ে গেছে। জীবনের গভীরতম ব্যাপারে যে নিরাসক্ত, প্রশান্তর সমস্ত আকুলতা যার কঠিন নির্বিকার ঔদাসীন্যে আঘাত খেয়ে ফিরে আসে, সংসারের সামান্য এই লাভ লোকসানের হিসাব তার কাছে এত মূল্যবান কি করে হতে পারে!

·

প্রশান্ত চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে খবরের কাগজটা টেনে নেয়। বিধ্বস্ত চীন চীৎকার করে তার মনোযোগ দাবী করছে। প্রত্যক্ষদর্শী একজন সংবাদিকের বিবরণ বেরিয়েছে। চোখের ওপর তিনি বিশাল নগরকে ধ্বংস হতে দেখেছেন। নগরের বিচিত্র জটিল জীবন-লীলায় পড়েছে অকস্মাৎ রাসায়নিক ছেদ। নগরের ধ্বংস স্তূপের মাঝে মৃত ও মুমূর্ষু নরদেহ সব প্রোথিত হয়ে আছে, মাতার ও শিশুর, প্রিয়া আর প্রেমিকের, বন্ধু ও শত্রুর। ছাপার হরফে সে ছবি আর কতটুকু পাওয়া যায়! অক্ষরগুলো অনুবাদ করে যে ছবি গড়ে ওঠে তার উপকরণ ত প্রত্যেকের নিজের মন থেকেই নেওয়া। নিজের মনের ছবিই ত অস্পষ্ট হয়ে আসে। থার্মোফ্লাস্কের টিনের খোলে যে টোল-খাওয়ার দাগ;— সেটা কখনকার?

মাছ ধরতে গিয়ে বোধ হয়। কলকাতা থেকে কিছু দূরে রেলওয়ে 'কাটিংসের বিরাট জলায় সেবার গেছ্‌ল মাছ ধরতে বেশ সমারোহ সহকারে।

ধূলি-ধূসর

"মাছ ত কত ধরবে জানি! আয়োজনে যা খরচ করলে তাতে দু'চারটে বড় বড় মাছ কেনা যেত"—মায়া বলেছিল যাবার সময়।

প্রশান্ত হেসে বলেছিল,—"সেটা মাছ কেনা হ'ত, মাছ ধরা নয়। মাছ ধরায় মাছটা নগণ্য। পুরুষের এ নিষ্কাম বিলাসের মর্ম তোমরা বুঝবে না। তুমি ফ্লাস্কটা ভর্তি করে চা দাও দেখি।

"অত চা কি হবে! তুমি যা চা-খোর, এক পেয়ালাই ত যথেষ্ট তোমার একলার।"

"একলা কি! অরুণবাবু যাচ্ছেন ত! এলাহাবাদ থেকে গ্রীষ্মের ছুটিতে এসেছেন, তোমায় বলিনি বুঝি!"—যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক কণ্ঠে সাধারণ ভাবে বলার চেষ্টা করেছে প্রশান্ত।

"এই ত বল্লে!"—মায়ার চোখের দৃষ্টি দুর্বোধ।—"কিন্তু একসঙ্গে মাছ ধরতে যাওয়ার মত আলাপ তোমাদের কখন হ'ল?"

এবারেও মায়ার এ ধরণের প্রতিক্রিয়া প্রশান্ত আশা করে নি। নিজের তৈরী যন্ত্রণাটা নিদারুণ করে তোলার নেশায় সে বলেছিল, —"হ'ল এই দু'দিনেই। ইচ্ছে থাকলে আলাপ করতে কতক্ষণ লাগে! তবে মাছ ধরতে যাচ্ছেন আমার পেড়াপীড়িতে। তাঁর বিশেষ সখ নেই।"

"তোমার-ই কি শুধু মাছ ধরার সখ!"—বলে মায়া চলে গেছল প্রশান্তকেই কেমন একটু অপ্রস্তুত করে রেখে।

সারাক্ষণ সেদিন বৃষ্টি পড়েছে, কখন মুষলধারে, কখন ঝিরঝিরিয়ে। তার সঙ্গে মাঝে মাঝে প্রবল হাওয়া। কাটিংসের বিস্তীর্ণ জলার ধারে প্রকাণ্ড মাছ ধরার ছাতির তলায় ওয়াটারপ্রুফ মুড়ি দিয়ে নিরাপদে নির্জনে বসে থাকাটাই উপভোগের জিনিস। জলের গায়ে বৃষ্টির ছাটে ক্ষণে ক্ষণে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ছে, মসৃণ সিল্কের কাপড়ের মত জল ভাঁজে ভাঁজে কুঁচকে যাচ্ছে হাওয়ার বেগে, দূরে রেলের বাঁধ ঝাপ্‌সা হয়ে যাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। আকাশে গাঢ় কালো থেকে

ফ্যাকাশে ছাই রঙের নানা জাতের মেঘের বিচিত্র আলোড়ন। আর প্রকৃতির এই বিশুদ্ধ অসীমতার রূপের মধ্যে মানুষের একটু জুৎসই যান্ত্রিক ভেজাল—মাঝে মাঝে দূরের এম্‌ব্যাঙ্কমেণ্টের ওপর দিয়ে দুরন্ত বেগে ট্রেণ যাচ্ছে ছুটে, সমস্ত দৃশ্যকে একটি দুর্লভ অপ্রত্যাশিত মহিমা দিয়ে।

কিন্তু প্রশান্ত এসব উপভোগ করেছে কি? বোধ হয় না।

"আপনার চারে যেন মাছ এসেছে মনে হচ্ছে!"—প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করেছে। কাছাকাছি দুটি ছাতির তলায় তাদের আসন।

"না, ও শুধু জলের ছাটে ফাৎনা কাঁপছে।"—অরুণবাবু বলেছেন।

"মাছের ত দেখা নেই। এসেছেন বলে এখন আফ্‌শোষ করছেন না ত?"

"কোন কিছুর জন্যে বৃথা আফ্‌শোষ করা আমার স্বভাব নয়।"—অরুণবাবু বেশ বক্তৃতার মত স্বর করে বলেছেন।

প্রশান্ত মনে মনে হেসেছে। অরুণবাবুর এই সস্তা খেলো দিকগুলো আবিষ্কার করে এ ক'দিন তার আনন্দের সীমা নেই। লোকটাকে ঘৃণা করবার এমন সৌভাগ্য তার হবে সে বিশ্বাস করতে পারে নি।

সত্যি লোকটা মেকী, আগাগোড়া নকল—নকল, কখন কোন উপন্যাসের, কখন কোন নতুন-পড়া মনস্তত্ত্বের বই-এর, কখন একেবারে সাধারণ গড্ডলিকা-সংস্কারের। তৃতীয় শ্রেণীর নাটকের এক সাজান হতাশ প্রেমিক!

এই সস্তা নকল লোকটাকে উপলক্ষ করে নিজেকে এতখানি যন্ত্রণা দেওয়ার কি কোন প্রয়োজন আছে? এ প্রশ্ন তার মনে না উঠেছে তা নয়। কিন্তু তবু একেবারে নির্বিকার হ'তে তখনো সে পেরেছে কই!

হয়ত এমন করে বিচলিত হবার কিছুই নেই। সে নিজেও বুঝি নকল, তৃতীয় শ্রেণীর না হোক প্রথম শ্রেণীর নাটকের নায়কের। পুঁথিগত আবেগের তাড়নায় চালান যন্ত্র। এই ধার-করা খোলসটা খুলে ফেল্লেই হয়ত সব সহজ হয়ে যায়, সমস্ত সম্বন্ধ যায় সরল হয়ে। আসলে কোন জটিলতাই হয়ত নেই, কাল্পনিক জগতে কাল্পনিক সত্তা সৃষ্টি করে সে নিজেকে দগ্ধ করেছে অকারণে।

কিন্তু এ কাল্পনিক সত্তা বিসর্জন দেবার আর বুঝি উপায় নেই। একদিন

ব্যাপারটা নিয়ে সে অনায়াসে পরিহাস করেছে। চার বছর বাদে বিদেশ থেকে ফেরবার পর গায়ে-পড়া হিতৈষীরা তার বাগদত্তা ভাবী পত্নী সম্বন্ধে সত্য মিথ্যায় মিলিয়ে শোনাতে তাকে কিছু বাকী রাখে নি।

সে নিজেই মায়াকে তাই পরিহাস ক'রে বলেছিল,—"আমার অসাক্ষাতে আর একটু হলেই নাকি তুমি লুট হয়ে যাচ্ছিলে! এলাহাবাদের এক অধ্যাপক নাকি উঠে পড়ে লেগেছিলেন?"

মায়াও পরিহাসের সুরে ঘুরিয়ে উত্তর দিয়েছিল,—"তুমি কি আমাকে অতটা দামীও মনে কর না!"

প্রশান্ত হেসে বলেছিল,—"নিশ্চয়ই করি এবং সেই জন্যে আমার মত বিচক্ষণ জহুরী আর কে আছে দেখতে চাইছি। তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'লে খুশী হ'তাম।"

মায়া গম্ভীর হয়ে বলেছে,—"না খুশী হ'তে না।"

প্রশান্ত তখন হেসেছিল উচ্চৈস্বরে, কিন্তু সে হাসি কবে থেকে নিবে গেছে সে নিজেই ঠিক বুঝতে পারে নি। নিজেকে সে বোঝবার চেষ্টা করেছে—এটা ভালো নয়, এটা অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ। আধুনিক সভ্য মানুষের মনে এসব জিনিসের জায়গা নেই। কিন্তু ধীরে ধীরে তবু তার মন বদলে গেছে। হৃদয়ের কোন গভীরতায় গোপন এক ক্ষত ক্রমশঃ উঠেছে জেগে। আশ্চর্য এই যে, সে ক্ষতের বেদনা যত দুঃসহ হয়ে উঠেছে তত প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে তার ভালোবাসার তীব্রতা। মায়াকে এমন করে কোনদিন সে ভালোবাসতে পারে নি।

সেই জ্বলন্ত আকুলতার তুলনায় এই মেকী লোকটির ভেজাল অভিনয়ের কি মূল্য থাকতে পারে! যতই আন্তরিক, যতই অচেতন সে অভিনয় হোক না কেন! কিন্তু তাহলে মায়ার এই নির্লিপ্ত নিস্পৃহ ঔদাসীন্যের মূল কোথায়!

প্রশান্ত ফ্লাস্কটা খুলে পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে এবার বলেছে,—"আফশোষ করবার মত তেমন কিছু গুরুতর ব্যাপার আপনার জীবনে ঘটেনি বলে তাই"—

অরুণবাবু নাটকীয় হয়ে উঠেছেন তৎক্ষণাৎ—"গুরুতর ব্যাপার! না গুরুতর ব্যাপার আমাদের জীবনে কি ঘটতে পারে, প্রশান্তবাবু,—আমাদের পোষাকী পোষ-মানা জীবনে? আমাদের পৃথিবী ওলটপালট হয় না। একটু কেঁপে ওঠে না পর্যন্ত কখন।"

প্রশান্ত ঈষৎ হেসে বলেছে,—"কলকাতায় এসেছেন অথচ দেখা করতে যান নি বলে মায়া দুঃখ করছিল।"

অত্যন্ত করুণ পরিহাসের স্বরে, অরুণবাবু বলেছেন—"তার কাছে অনেক বড় দুঃখ আমার পাওনা। অত সামান্য দুঃখে আমার অপমান হয়—বলবেন!"

হেসে উঠে প্রশান্ত এবার ফ্লাস্কটা এগিয়ে দিয়ে বলেছে,—"বলব। এখন একটু চা-খাওয়া যেতে পারে,—কি বলেন! আপনি এসেছেন শুনে মায়া তৈরী করে দিলে।"

"তাই নাকি! তা হলে এ চায়ের সম্মান রাখতেই হয়।"—বলে অরুণবাবু হাত বাড়িয়েছেন। দিতে গিয়ে হঠাৎ ফ্লাস্কটা বুঝি দৈবাৎ ফসকে গেছে প্রশান্তর হাত থেকে। ছিপিটা বুঝি আল্‌গা ছিল, খুলে গিয়ে সব চা মাটিতে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। প্রশান্ত লজ্জিত হয়ে উঠেছে,—"দেখুন দিকি! এত যত্ন করে তৈরী, এত কষ্টে বয়ে আনা…"

ফ্লাস্কের খোলে তখনই টোল পড়েছিল বোধ হয়। বাড়ীতে ফেরবার পর মায়া সেটা লক্ষ্য ক'রে জিজ্ঞেস করেছিল,—"এটা আবার তুবড়ে আনলে কি করে?"

"ও! হঠাৎ হাত ফস্কে পড়ে গেল যে! তোমার হাতের চা খেয়ে কিন্তু অরুণবাবু তারিফ করেছেন।"

মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে যেতে মায়া শুধু বলেছিল,—"তিনি ত চা খান না!"

"তুমি ত তাও মনে করে রেখেছ দেখছি!"—প্রশান্তর কণ্ঠের জ্বালা বুঝি লুকোন যায় নি। আত্মসংযম হারাবার ভয়ে সে নিজেও তাই সেখানে আর দাঁড়ায় নি। চলে যেতে যেতে হঠাৎ তার মনে হয়েছে—অরুণবাবুর সস্তা নাটুকেপনাও কি একটা ভান! এটা কি একটা আবরণ!

ধূলি-ধূসর

প্রশান্ত চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে এবার খবরের কাগজটা নিয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়ে। চীনের সংবাদটা আদ্যোপান্ত তার পড়ে ফেলতে হবে এখুনি, মৃত্যুর উন্মত্ত তাণ্ডব লীলার সেই ভয়ঙ্কর রূপ ধরা যায় কিনা দেখতে হবে। চীন অবশ্য সুদূর, ভৌগোলিকের চেয়ে মানসিক জগতে বুঝি আরো বেশী। তার মুখ অস্পষ্ট ধূসর, ফ্যাকাসে পুরাণো রঙ-উঠে যাওয়া ছবির মত। প্রত্যক্ষ বাস্তবতায় তাকে, তলিয়ে ভাবা সহজ হয় না। তার বোমা-বিধ্বস্ত নগরের আর্তনাদ যেন স্বপ্নে শোনা কান্নার মত কাগজের হরফের ভেতর থেকে অশরীরী ক্ষীণ হয়ে বেরোয়। কিংবা চীন সুদূর ও অস্পষ্ট বলে নয়, যে কোন খানেই এত বিরাট প্রলয়-লীলার সামনে মানুষের মন অভিভূত, বিকল, পঙ্গু—তার ধারণায় এত বড় বিস্তৃত ট্রাজিডির উপলব্ধি কুলোয় না। মৃত্যুকে একটি ছোট ঘরে প্রিয়জনের শীর্ণ বিবর্ণ মুখে সে বড় জোর চেনবার চেষ্টা করতে পারে। তাও তার কাছে দুঃসহ।

থার্মোফ্লাস্কটা অবশ্য অনেক আগেই ফেলে দেওয়া যেত, তখুনি সেটা অকেজো হয়ে গেছে।

মায়া শীর্ণ বিবর্ণ মুখটা একটু বিকৃত করে বলেছে,—"কই, জল ত ঠাণ্ডা নয়।"

প্রশান্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে,—"এই ত ফ্লাস্কটা থেকে ঢাললুম। ফ্লাস্কটা খারাপ হয়ে গেছে দেখছি। দাঁড়াও…"

মায়া জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন অবস্থাতেই চোখ মেলে বলেছে,—"না, না ব্যস্ত হতে হবে না। ওই জলই দাও আরেকটু।"

"কিন্তু এ ত ঠাণ্ডা নয়, তোমার খারাপ লাগবে।"

"না লাগবে না"—অতিরিক্ত জোর দিয়ে বলবার চেষ্টায় মায়ার শরীর কেঁপে উঠেছে।

"অত জোর দিয়ে কথা বোলো না"—প্রশান্ত শঙ্কিত ব্যাকুলতায় মায়াকে জড়িয়ে ধরেছে।

মৃত্যুর গাঢ় ছায়া প্রশান্ত তখনই দেখতে পেয়েছিল সেই ম্লান রোগশয্যার

ওপরে, শুনতে পেয়েছিল তার নিঃশব্দ পদক্ষেপ। বুক তার হা হা করে উঠেছিল শুধু মায়াকে হারাবার হতাশায় বুঝি নয়। শুধু তার মৃত্যুম্লান যন্ত্রণা-কাতর মুখ সহ্য করতে না পারায় নয়।

জানা হ'ল না, কিছুই জানা হ'ল না। নিষ্ঠুর যবনিকা এল নেমে, তবু উত্তর মিলল না রক্তাক্ত হৃদয়ের ব্যাকুল প্রশ্নের,—বিষাক্ত কীটের মত যা তার বুক ভেদ করে বেরিয়েছে।

মায়া অনেক দিন থেকেই নিজেকে সরিয়ে রেখেছিল, এবার সরে গেল একেবারে, সমস্ত জিজ্ঞাসার বাইরে, যেন সাগ্রহে স্বেচ্ছায়।

শেষ পর্যন্ত সেই নিরুত্তর অন্ধকার যদি এতটুকু সরে যেত!

ডাক্তার পরীক্ষা শেষ করে মাথা নেড়ে চলে গেলেন। শুধু বলে গেলেন,—"আপনি এবার ভেতরে যান।"

চেতনা তখন নিবে আসছে,—মাঝে মাঝে একটু ঝিলিক দিয়ে ওঠে। মায়া তাকে চিনতে পারলে কিনা কে জানে, কিন্তু বল্লে,—"তুমি এসেছ!"—চোখের পাতা একটু খুলেই বন্ধ হয়ে গেল।—"তুমি আর যেও না।" জড়িত অস্পষ্টস্বরে অতিকষ্টে কথাগুলো বেরিয়ে এল।

আবার আচ্ছন্নতা। প্রাণপণে নিশ্বাস টানার চেষ্টার অস্বাভাবিক শব্দ।

"মায়া!"—প্রশান্ত তাকে জাগাবার চেষ্টা করলে ধরা গলায়।

চোখের পাতা বুঝি একটু কাঁপল, আভাস পাওয়া গেল একটু চেতনার।

"মায়া, অরুণবাবু এসেছেন দেখতে, অরুণ···"

চোখ বুজেই মায়া বল্লে,—"জানি।"

"তাঁকে ডাকব?"—প্রশান্তের নিষ্ঠুর আত্ম-পীড়নের নেশা কি তখনও কাটে নি!

কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া গেল না। মায়া আবার বুঝি তলিয়ে গেছে অচেতনায়।

হঠাৎ আচ্ছন্নতার ভেতরে নিজে থেকেই বলে উঠল,—"আমায় তুমি ভুল বুঝো না। আমি তোমাকে দুঃখ দিতে চাই নি···।"

ধূলি-ধূসর

চেতনার শেষ স্ফুলিঙ্গ অন্ধকারকে চমকিত করেই মিলিয়ে গেল।

"কাকে বলছ মায়া? কাকে?"—প্রশান্তর আর্তকণ্ঠ ঘরের বাইরে থেকেই বুঝি শোনা গেল।

তখন অনন্ত স্তব্ধতা নেমেছে

…শত্রুর আক্রমণের আভাস পেতেই দলে দলে কাতারে কাতারে নগরের লোক বিদেশীদের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আস্তানার দিকে ছুটেছে। কিন্তু সেখানে পৌঁছোবার ভাগ্য সকলের হয় নি। যারা পৌঁছেছে তাদেরও সকলের জায়গা সেখানে কোথায়! বিদেশী আস্তানার ভেতরে বাইরে ভীত উন্মত্ত জনতা ব্যাকুল ভাবে ঠেলাঠেলি করেছে অসহায় পশু-যূথের মত। আকাশে মৃত্যুদূতের মত শত্রুর এরোপ্লেন গর্জন করে এসেছে। নির্মম নির্বিকার ভাবে নির্বিচারে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে অসংখ্য জীবনের পাতা,—কত সূক্ষ্ম বিচিত্র রঙে, রেখায়, ভঙ্গিতে আঁকা। বিচিত্র অনুভূতিতে রঙীন, জটিল হৃদয়াবেগে উদ্বেল, স্মৃতি ও স্বপ্নের অজস্র ধারায় সরস, অসংখ্য জীবন এক পলকে রক্তাক্ত মাংসস্তূপ হয়ে উঠেছে।

জীবনের দেবতার এরকম পাইকিরি ট্র্যাজিডির কারবার এই প্রথম নয়। যুগে যুগে পৃথিবীময় ছড়ানো ধ্বংসস্তূপের আবর্জনায় একটা রঙ-চটা টোলখাওয়া থার্মোফ্লাস্ক, আর একটা বুক-চেরা প্রশ্ন!

অনন্তবাবু একটু নাসিকা কুঞ্চিত করেন।—মানবতা আর তোমাদের সার্বজনীন প্রেম! ও-সব অরণ্যে আর রাজপ্রাসাদেই মানায়, মানুষের কনুই-এর গুঁতো খেতে খেতে যাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত তাদের কাছে ও-সব অসহ্য! আমার বরং সেকাল ভালো! পৃথিবীতে মানুষ তখন এত বেশী ছিল না, থাকা সম্ভব ছিল না, এই অশ্লীল অভদ্র ভীড় যেখানে সেখানে। মানুষকে ভালোবাসার জন্যেও একটু ফাঁক দরকার মাঝখানে!

স্বরটা আধা পরিহাসের, কিন্তু নাক সিঁটকানোটা ভান নয়। থার্ড ক্লাসের জনতার উগ্র অপ্রীতিকর গন্ধটা সত্যিই নাকে যাচ্ছে, মানবতার স্পর্শটা বড় স্থূল রকমের ঘনিষ্ঠ।

বিজয় একটু হাসে, সে-ই জোর করে অনন্তবাবুকে থার্ড ক্লাশে তুলেছে। অনন্তবাবুর এ ধারণার প্রতিবাদ সে করতে চায় না। শুধু বলে, কিন্তু আপনিও ত এই অভদ্র অশ্লীল ভীড়ের একজন!

সেটা আমার হাত না হলেও আমি লজ্জিত এবং সে কথাটা ভুলে থাকারও তাই যথাসাধ্য চেষ্টা করি।—অনন্তবাবু আরো উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।—খোদার ওপর খোদকারী করতে গিয়ে আমরা কি কেলেঙ্কারীটা করেছি তা ভেবে দেখেছ কখনো। প্রকৃতি ঠাকরুণের পাল্লায় বিজ্ঞানের পাষাণ চড়িয়ে, তাঁর ভাগবাঁটরার ব্যবস্থা উল্টে দিয়ে কি পরিণাম হয়েছে!—মানুষ আর মানুষ, পৃথিবীময় গিজ গিজ করছে, কিলবিল করছে মানুষ—যেন পৃথিবীর কদর্য চর্মরোগ। মানুষের মাংসপিণ্ডের ভারেই মনুষ্যত্বের সব আশা ভরসা থেৎলান!…ও…!

অনন্তবাবু বক্তৃতার মাঝখানে হঠাৎ আর্তনাদ করে ওঠেন। দলিত মনুষ্যত্বের বেদনায় নয়, তাঁর নিজের দলিত 'কড়া'র যন্ত্রণায়। তাঁর হাফপ্যাণ্ট পরা সাহেবী বেশ এবং উগ্র চেহারার জন্যে আশপাশের যাত্রীরা এতক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে যতদূর সম্ভব সমীহ করে এসেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একজনের

নিরাশ্রয় নাগরাসমেত পা তাঁর বুটের ঠিক মর্মস্থানের উপর গিয়ে পড়েছে কেমন করে।

অনন্তবাবু ইংরাজী, বাংলা ও হিন্দি, তিন ভাষার সাহায্যেও নিজের মনোভাব যেন যথেষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারেন না। অপরাধী প্রথমে সঙ্কুচিত লজ্জিত ও পরে বেপরোয়া হয়ে স্পর্দ্ধিত হয়ে ওঠে—সাহেব লোক থার্ড ক্লাশের ভীড়ে আসে কেন, এই তার বক্তব্য।

বিজয় তার কৌতুক দমন করে অনেক কষ্টে মৌখিক কলহটাকে শারীরিক পরিণাম থেকে বাঁচায়। গাড়ী তখন রাণীগঞ্জ স্টেশনে এসে থেমেছে।

অনন্তবাবু সরোষে উঠে পড়ে বলেন,—"দরকার নেই আমার গান্ধীয়ানাতে। আমি ইণ্টার ক্লাশে চল্লাম।"

"কিন্তু সেখানে যে ঢুকতেই পাবেন না! গাড়িতে কি কোথাও জায়গা আছে? তবে সেকেণ্ড ক্লাশে চেষ্টা করে দেখতে পারেন!"—বিজয় তাঁকে জানায়।

অনন্তবাবু আবার বসে পড়েন। আভিজাত্যের চেয়েও বড় গরজ তাঁর মিতব্যয়িতার।

বিজয় এবার উঠে পড়ে বলে,—"আমি একবার ওদের দেখে আসি। কিছু দরকার টরকার যদি হয়।"

অনন্তবাবু উদাসীনভাবে বলেন,—"ইচ্ছে হয় যাও। কিন্তু তোমার জায়গার গ্যারান্টি দিতে পারব না।"

বিজয় হেসে দরজার দিকে সন্তর্পণে অগ্রসর হয়। অগ্রসর হওয়া অবষ্ট্যাকল্ রেসের চেয়েও কঠিন। বেঞ্চিতে, ব্যাঙ্কে মেঝেতে কোথাও বুঝি আর ফাঁক নেই। আসবাবে আর মানুষে একেবারে ঠাসা। ছুটির দিন, তার ওপর রেলের সস্তা ভাড়ার সুযোগ নিতে কেউ যেন ছাড়ে নি। সমস্ত বিহার প্রদেশই যেন দেশে ফিরছে, তার সঙ্গে সমস্ত বাংলা প্রদেশ চলেছে চেঞ্জে।

কিন্তু বিজয়ের একবার না বেরুলে নয়। মেয়েদের গাড়ীর অবস্থা এর চেয়ে নিশ্চয় ভালো নয়। দিদি সঙ্গে আছেন এই যা ভরসা, কিন্তু এই ভীড়ের ভেতর

দিদিই বা কি করতে পারেন। একটু জল দরকার হলে তারা পাবে কি না সন্দেহ। তার ওপর করুণা যে রকম ভয়-কাতুরে লাজুক। এত ভীড়ে কি তার অবস্থা হয়েছে কে জানে! মুখ ফুটে সেত কাউকে কিছু বলতেও পারবে না।

পরের ও নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাঁচিয়ে অতি কষ্টে বিজয় দরজার দিকে এগুতে থাকে। চার হাত দূরের দরজাটা যেন চার যোজন পথ, পায়ের দুর্ভেদ্য অরণ্যের ভিতর দিয়ে। পা ঝুলছে বাঙ্কের ওপর থেকে, বেঞ্চির ওপর থেকে পা নেমে এসেছে, মেঝেয় ছড়ানো পা।

অতি কষ্টে দরজার কাছে পৌছেও বাইরে বেরুনো আর হয় না। গলায় কণ্ঠি গায়ে নামাবলি জড়ানো, নেহাৎ বৈষ্ণব চেহারার একটি আধা বয়সী শুকনো চেহারার লোক সবলে দরজা ঠেলে ধরে আছেন।

"করছেন কি মশাই! দরজা খুল্লে আর রক্ষা আছে! বুনো মোষের পালের মত সব ঢুকে পড়বে দেখছেন না।"

বিজয় দেখেছে বই কি! প্লাটফর্ম যেন হাটকে হার মানিয়েছে। মানুষের একটা বিশাল তাল। অসহায় একদল সাঁওতাল স্ত্রী-পুরুষ তারি ভেতর মোটঘাট নিয়ে ট্রেণের দরজায় দরজায় কাতরভাবে আশ্রয় চেয়ে ফিরছে। পুরুষদের পিঠে বাঁধা মোট, মেয়েদের পিঠে বাঁধা ছেলে-মেয়ে। এমন অবোধ অসহায় পশুর মত কাতরতা, তাদের দৃষ্টিতে যে মায়া হয়। এ ট্রেণে বুঝি তাদের না গেলেই নয়। এর আগে কত ট্রেণে তারা এমনি উঠতে গিয়ে হতাশ হয়েছে কে জানে। পারতপক্ষে কে তাদের যায়গা দেবে!

কিন্তু মায়া মমতার সময় এ নয়। সাঁওতাল কুলিদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত সাহসী তারা দরজা পর্যন্ত এসে ঠেলে ঢোকবার চেষ্টা করে। কাতরভাবে জানায় যে তাদের টিকেট আছে, কেন তারা যেতে পাবে না!

বৈষ্ণব বাবাজী খেঁকিয়ে ওঠেন—টিকিট আছে ত মাথা কিনেছিস্। জায়গা থাকলে ত উঠবি। যত সব জানোয়ার!

গালাগালটা রূঢ় হলেও কথাটা ঠিক! জায়গা নেই। বিজয়কেও দরজা আটকে রাখতে সাহায্য করতে হয় আত্মরক্ষার অজুহাতে। মনটা কেমন খারাপ

হয়ে যায় তাদের অসহায় কাতর মুখগুলোর দিক চেয়ে। গোলমালের ভেতর ট্রেণ আবার ছেড়ে দেয়। নামা আর হয় না।

পরের স্টেশনে কিন্তু নামতেই হবে। পায়ের অরণ্য পার হয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসা এবং আবার উঠে আসার উৎসাহ আর বিজয়ের নেই। দরজার কাছেই আড়ষ্ট হয়ে পরের স্টেশনের অপেক্ষায় সে দাঁড়িয়ে থাকে। বাঙ্কের একেবারে প্রান্তে স্তূপাকার কয়েকটা পরের পর সাজানো মোট বিপজ্জনকভাবে ট্রেণের ঝাঁকানীতে দুলছে। মাঝে মাঝে বিজয়কেই ঠেলে সেগুলো সোজা করে দিতে হয়। নীচের মেঝের এই ভীড়ের ভেতরই কে গাঁজার মৌতাত চড়িয়েছে। উগ্র কটু গন্ধ এড়াবার জন্যে মুখটা বাড়িয়ে দিতে হয় জানালা দিয়ে। তাতেও বিপদ কম নয়। ইঞ্জিনের কয়লার গুঁড়ো এসে চোখে পড়ে।

রাণীগঞ্জ থেকে আসানসোল যেতে মাত্র কুড়ি মিনিট যেন আর কাটতে চায় না। বাইরের ধাবমান দৃশ্যের দিকে চেয়ে কতবার ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে অক্লান্ত-ভাবে ট্রেণে কাটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বাইরের দৃশ্যে আর যেন সে মোহ নেই। টেলিগ্রাফের পোষ্টও তার একঘেয়ে ভাবে দোল খেয়ে চলে যাচ্ছে। শরৎকাল হলে কি হয়, আকাশে মেঘের গুমোট, পৃথিবী যেন ঝিমোচ্ছে আইঢাই শরীর নিয়ে।

করুণার খুব অসুবিধে হচ্ছে বোধ হয়! কোথায় গেল দু'জনে এক কামরায় কাছাকাছি বসে যাওয়ার কল্পনা! ভীড়ের চোটে বাধ্য হয়ে মেয়েদের গাড়ীতে তাদের তুলে দিতে হয়েছে।

একসঙ্গে এক কামরায় যেতে পারলে বড় ভালো হতো। ট্রেণে একসঙ্গে যাওয়ায় কি যেন একটা আলাদা উত্তেজনা আছে। গাছপালা মাঠ বন নয়, সময়ের স্রোত যেন পায়ের তলা দিয়ে তর তর করে বয়ে যায়।

একসঙ্গে এক কামরায় যাওয়া কখন তাদের ঘটে ওঠে নি। যাবে আর কখন, এই ত দ্বিতীয়বার বিয়ের পর তাদের দেখা। এ পর্যন্ত আলাপ করবারই কতটুকু সুযোগ তারা পেয়েছে। বাড়ীতে ঘর বেশী নেই, বিয়ের সময় আবার আত্মীয়-

স্বজনে ঠাসাঠাসি। টিনের পার্টিশন দেওয়া একটা ছোট কুঠুরি তাদের ফুলশয্যার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। কুঠুরিটা এত ছোট যে বিয়ের খাটেই সেটা জুড়ে গিয়েছিল বেশীর ভাগ। তার ওপর ফুলশয্যার তত্ত্বের জিনিষপত্র ট্রাঙ্ক স্যুটকেশ-গুলো রেখে তাদের নিজের নড়াচড়ার জায়গাই ছিল না।

কুঠুরিটা আলাদা হয়েও যেন আলাদা নয়। ফুলশয্যার মধুর নির্জনতার চারিধারের জনতা চড়াও হয়ে এসেছে নানাভাবে। জায়গা অভাবে ঘরের বাইরে বারান্দাতেই অনেককে শুতে হয়েছে। সারারাত তাদের নড়াচড়া কথাবার্তার আওয়াজ। পাশের ঘরটি দূর সম্পর্কের এক পিসি তাঁর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে দখল করেছিলেন। তাদের একটি আবার রুগ্ন। সারারাত থেকে থেকে তার কেঁদে ওঠা—পিসিমার সান্ত্বনার চেষ্টা। টিনের পার্টিশনে, ঘুমের ভেতর ছটফট করতে করতে কোন ছেলের পায়ের লাথি,—এরি ভেতর পরস্পরের পরিচয় নেবার তাদের সলজ্জ চেষ্টা।

এ-রকম ব্যাপারে সে অবশ্য নিজে অভ্যস্ত। যতদূর মনে পড়ে জায়গার টানাটানি, হাত পা ছড়িয়ে আয়েস করবার মত স্থান ও নির্জনতার অভাব সে চিরকাল ভোগ করে এসেছে। নিভৃত একটা ঘর কখনও তার ভাগ্যে জুটেছে বলে ত মনে করতে পারে না।

চিরকালই তাদের প্রকাণ্ড সংসার অর্থের অভাবে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক সঙ্কীর্ণ একটা বাড়ীর মধ্যে আবদ্ধ। ঘরে কুলোয় না,—যেমন তেমন করে মানিয়ে নিতে হয়। ছেলেবেলা একটি ছোট ঘরে তাদের চারজনের কেটেছে। খুড়তুত, জেঠতুত তারা তিন ভাই আর এক সমবয়সী মামা। পড়াশোনা শোয়া সবই সেই ঘরে। বাড়তি অতিথি এলে সে ঘরেই আবার তাদের জায়গা দিতে হয়েছে। আর ঘর কোথায়! তখন অবশ্য খুব অসুবিধা বোধ হয় নি! এক রকম গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। তার গোপন ডায়রী যেদিন সবাই বার করে প'ড়ে হাসাহাসি করেছিল সেদিন অবশ্য রাগ হয়েছিল, দুঃখ হয়েছিল বড় বেশী। ডায়রী লেখার নেশা তাকে ছাড়তে হয়েছিল তারপর। এ-রকম হয়ত আরো ঘটনা স্মরণ করতে পারে। কিন্তু সবশুদ্ধ জড়িয়ে খুব একটা অস্বস্তি বোধ করে নি। বোধ করবার শক্তিই ছিল না!

ধূলি-ধূসর

কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রিটা একটু আলাদা হলেই ভালো হত। বিয়ের উৎসব শেষ হবার পর বাড়ীঘর একটু ফাঁকা হতে না হতেই করুণাকে শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যেতে হয়েছে। তারপরই হঠাৎ চাকরী পেয়ে যেতে হয়েছে বিদেশে। বিয়ের পর তখুনি একা স্ত্রীকে নিয়ে চাকরীর জায়গায় যাওয়া যায় না। তাদের বাড়ীর সেরকম দস্তরও নয়।

তারপর এই পূজোর ছুটিতে বাড়ী ফিরেছে। ফিরে আসা নামমাত্র। পরদিনই, এইত আবার চলেছে মধুপুরে। মা বাবার সেই রকমই আদেশ। বাড়ীর সবাই অনেকদিন অল্প-বিস্তর নানারোগে ভুগছে। সস্তায় একটা বাড়ী পাওয়া গেছে মধুপুরে। সকলকে সেখানেই যেতে হবে পূজোয়। একদল আগেই রওনা হয়ে গেছে সেখানে। করুণাকে বাপের বাড়ী থেকে আনিয়ে বিজয়ের জন্যে দিদি আর ভগ্নীপতি অনন্তবাবু অপেক্ষা করছিলেন। আজ তাঁদের নিয়েই সে চলেছে এখন।

ছুটি তার অল্প। বেশীদিন মধুপুরে থাকা তার চলবে না। তারপরেও করুণাকে চাকরী-স্থানে নিয়ে যাওয়া নিশ্চয় সম্ভব হবে না। কলকাতার বাড়ীটা এখন অপেক্ষাকৃত ফাঁকা। এ ক'টা দিন করুণার সঙ্গে কলকাতায় কাটাতে পারলেই সে বোধ হয় বেশী সুখী হত। তারপর না হয় পৌছে দিয়ে যেত তাকে মধুপুরে। কিন্তু সে কথা পাড়বার সাহস তার হয়নি। নির্লজ্জভাবে অমন প্রস্তাব কি করা যায়!

যাই হোক মধুপুরও ভালো।—বেশ ভালো! ফেরার পর কাল একটিমাত্র রাত করুণার সঙ্গে সে নির্বিঘ্নে কাটিয়েছে। সেই কথাই তাদের হয়েছে তখন। বিজয়ের কাছে মধুপুর নতুন। করুণা বছর কয়েক আগে একবার মধুপুর গেছল তার বাবার সঙ্গে। সলজ্জভাবে সে একটি দু'টি কথায় মধুপুর কি রকম সুন্দর জায়গা তাই জানিয়েছে। কি সুন্দর সব বেড়াবার জায়গা! সে বর্ণনা করবার চেষ্টা করেছে বুঝি একটু। বিজয় উৎসাহিত হয়ে বলেছে—আমরা দু'জনে যাব বেড়াতে, শুধু আমরা! কি বল?

মনে মনে সে তখনই জেনেছে অবশ্য যে, ঠিক সে রকমটি সম্ভব হবে না। না

হোক, তবু মধুপুর ভালো, মধুপুর বলতে একটা বিস্তৃতি, একটা সুদূর প্রসারিত স্বাধীনতার উন্মাদনা যেন মনে আসে।

শুধু যাবার সময় এতটা ভীড় যদি না হোত।

আসানসোলে এসে গাড়ী থামে। বিজয় কারুর কথার তোয়াক্কা না করে গাড়ী থামতেই নেমে পড়ে প্ল্যাটফর্মে। অনন্তবাবু হেঁকে বলেন—একটা 'হিন্দু চা' ডেকে দিয়ে যেও, বুঝেছ। বিজয় সে কথায় তেমন কান দেয় না। এখন 'হিন্দু চা' খোঁজার তার সময় আছে বটে। অনন্তবাবুর হিন্দুত্বের কথা ভেবে মনে মনে তার হাসি পায়। 'কেলনারে' বেশী পয়সা লাগে বলেই তাঁর হঠাৎ এত গোঁড়ামি, সে জানে।

এখানেও প্ল্যাটফর্মে গিজ গিজ করছে লোকে। যাত্রী আর ফেরীওয়ালার ভীড় ঠেলে এগুনোই দায়। মেয়েদের ঠিক কোন কামরাটিতে তাদের তুলে দিয়েছে? প্ল্যাটফর্মটা উল্টোদিকে পড়েছে—চেনাই দায়। মেয়েদের কামরায় আত্মীয়স্বজনের ইতিমধ্যে ভীড় লেগে গেছে। প্রত্যেক জায়গায় তাদের ঠেলেঠুলে উঠে খোঁজ করা ভারী লজ্জাকর ব্যাপার। দিদির এমন বুদ্ধি! স্টেশনে জানালা দিয়ে একটু মুখ বাড়াতে পারেন না! জানালা দিয়ে মুখ বাড়ান অবশ্য সোজা নয়। গরু-ভেড়ার মত মানুষ একেবারে কামরায় কামরায় ঠাসা। নিজের জায়গা ছেড়ে নড়বার ক্ষমতা বোধ হয় কারো নেই। শেষকালে দেখাই করতে পারবে না, না কি?

খোঁজার পথে সেকেণ্ড ক্লাস একটা কামরা চোখে পড়তে বিজয়ের সত্যি একটা ঈর্ষা হয়। কি নিরুদ্বেগ স্বাচ্ছন্দ্য! স্বামী-স্ত্রী এদিকের বার্থটা বুঝি রিজার্ভ করে চলেছেন। পরিপাটি করে বিছানাটি পাতা, তার ওপর স্ত্রী ট্রে থেকে চা তৈরী করতে ব্যস্ত, স্বামী জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কোন ফেরীওয়ালাকে বুঝি ডাকছেন। মানুষের উন্মত্ত ঢেউ গাড়ীর ভেতর গাড়ীর ওপর যে আছড়ে পড়েছে তাতে তাদের ভ্রূক্ষেপও নেই।

মেয়েদের সঠিক কামরাটা এবার পাওয়া যায়। কিন্তু এই ভীড়ের ভেতর ওদের ডাকে কি করে। তবু বিজয়, দিদি বলে ডাক দেয় সঙ্কোচ দমন করে!

তার মনে হয় অপরিচিত মহিলারা যেন তার দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন! অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হয়। সে ভুল করেনি ত! না, ওইত দিদি! ওধারের বেঞ্চিতে। করুণাই প্রথম তাকে দেখতে পায়। মাথার ঘোমটা একটু টেনে দিয়ে দিদিকে জানাবার চেষ্টা করে তাঁর গায়ে হাত দিয়ে। দিদি তবু প্রথমটা বুঝতে পারেন না। করুণাকে সলজ্জভাবে এবার আঙ্গুল তুলে দেখাতে হয়। দেখিয়েই সে মাথা নামায় মুখ লাল করে।

গাড়ীতে সবাই যেন এক সঙ্গে কথা বলছে উচ্চৈঃস্বরে। এই হট্টগোলের ভেতর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তের চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে খবর নেওয়া এক হাঙ্গামা। তবু বিজয় জিজ্ঞাসা করে গলা চড়িয়ে,—"তোমাদের কিছু দরকার আছে ?"

দিদি শুনতে পাননা তবু। করুণাকেই বলেন,—"যাওনা বাপু, শুনে এস কি বলে !"

বিজয়ের বুকটা কেঁপে ওঠে কি ?

করুণা একটু ইতস্ততঃ করে। দিদি অত্যন্ত উদার হয়ে বলেন,—যাওনা, আমি বলছি দোষ নেই, আমার কি ওঠ্‌বার সাধ্য আছে! পা ধরে গেছে একভাবে বসে বসে।

করুণা লজ্জায় রক্তিম, আনন্দে উৎসুক মুখ নিয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে আসে ভীড়ের ভেতর দিয়ে। কই তার মুখে ক্লান্তির ছায়া ত নেই! বিজয় অবাক হয়ে দেখে করুণার মুখ উত্তেজনায় উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বরং।

"খুব কষ্ট হয়েছে ত ?"—তবু সে জিজ্ঞাসা করে। ভীড়ের মাঝখানেই এ এক অপরূপ নিভৃত লোক যেন তাদের চারিধারে সৃষ্টি হয়েছে।

"কষ্ট হবে কেন ?"—করুণা মৃদু অথচ উৎসাহদীপ্ত কণ্ঠে জবাব দেয়,—"কি রকম ভীড় দেখেছ !"

বিজয় আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকায়। করুণার চোখে দীপ্তি! এই ভীড় তাকে অবসন্ন করে নি, উন্মাদনা দিয়েছে! এ দৃশ্য যেন তার কাছে অপূর্ব !

"কিছু দরকার আছে না কি ? চা খাবে ?"—বিজয়ের মনেও খানিকটা উৎসাহ সংক্রামিত হয়ে গেছে বুঝি।

"চা ? না, একটু জল পেলে হ'ত।"

"জল ?···আনছি এখুনি।"—বিজয় ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

করুণা উদ্বিগ্ন হয়ে বলে,—"কিন্তু গাড়ী ছেড়ে দেবে যে, দরকার নেই জলের।"

"ভয় নেই, গাড়ী ছাড়তে দেরী আছে!"—বিজয় হেসে আশ্বাস দিয়ে নেমে যায়। জল! জল! কোথায় গেল পানিপাঁড়ে? গাড়ী সত্যিই যে ছাড়ে ছাড়ে। গার্ড ফ্ল্যাগ হাতে ট্রেণের এক প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যাকুল হয়ে বিজয় আইস-ভেণ্ডারের কামরায় খোঁজ করে, জল তাকে পৌছে দিতেই হবে যে! করুণা উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করে আছে।

ভাগ্যক্রমে একটা ফেরীওয়ালার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। মাটির ভাঁড়ে লেমোনেড ঢেলে নিয়ে সে নিজেই ছোটে করুণাদের কামরার দিকে। গাড়ী ছেড়ে দিচ্ছে! তবু সে পৌছে যাবে ঠিক সময়ে। একটুকু ত মাত্র!

পৌছান আর হয় না। গাড়ী ছেড়ে দেয়। পদে পদে লোকের ভীড়ের বাধা। উল্টোদিক থেকে দৌড়ে আসা একটা লোকের গায়ে লেগে ভাঁড়টা পড়ে ভেঙে যায়। লোকটা গাড়ীতে উঠতে না পারার আশঙ্কায় এমন ব্যাকুল যে, কিছু লক্ষ্যই না করে ছুটে যায়। বিজয় দুঃখে হতাশায় এমন অভিভূত হয়ে যায় যে রেগে উঠতেও পারে না। কোনমতে ঠেলেঠুলে চলতি গাড়ীর একটা কামরায় সে উঠে পড়ে।

এমন কিছুই নয়। একটু জল পৌছে দেওয়া! এখানে না হোক্ পরের স্টেশনে দিয়ে এলেই চলবে। করুণা এমন কিছু তৃষ্ণার্তও হয়নি।

তবু বিজয়ের মন একেবারে বিষণ্ণ হয়ে যায়। চারিধারে জনতা তার কাছে বিষ মনে হয়।

এই ট্রেণের রাস্তাটুকু মাত্র—এর পরই ত মধুপুর—দিগন্তবিস্তৃত স্বাধীনতা আর অবকাশ! না—এ চিন্তায়ও তার মন আর সান্ত্বনা পায় না।

ধূলি-ধূসর

মধুপুর কেমন হ'বে সে অনেক আগে থেকেই মনে মনে যেন জানে। সেখানেও জায়গা নেই, নেই এতটুকু নিভৃত অবসর।

জ্যেঠতুত ভাইয়েরা গেছে পুত্র পরিবার নিয়ে, মামারা এসেছেন সদলে। মাসিমা আসছেন তাঁর ছেলে, মেয়ে, জামাই নিয়ে দেশের ম্যালেরিয়া সারাতে। আত্মীয়তার একটা রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন। আদর্শ হয়ত খুব বড়; কিন্তু নিজেকে স্বার্থপর, আত্মসুখী বলে ধিক্কার দিয়েও সে মনের উদ্ধত বিদ্রোহ দমন করতে পারে না। অসহ্য এই ভীড় আর ভীড়, অযাচিত সান্নিধ্যের উপদ্রবের গ্লানি আর অবসাদ।

তবু কোনদিন তার মুক্তি নেই সে জানে। মুক্তি নেবার সঙ্গতি বা সাহস কিছুই তার নেই।

তার মিতব্যয়ী দার্শনিক ভগ্নীপতি অনন্তবাবু আস্ফালন করবেন, শাসাবেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই অবস্থাতেই নিজেকে জানিয়ে নিয়ে নিজের সুবিধাটুকু সংগ্রহ করে নেবেন নির্লজ্জভাবে। শুধু সে জর্জরিত হবে অক্ষম আক্রোশে আর আত্মগ্লানিতে।

ভস্মশেষ

বারান্দার এদিকটা সরু। নিচে নামবার সিঁড়িরও খানিকটা ভেঙে পড়েছে। তবু সন্ধ্যের আগে এই দিকেই চেয়ারগুলো ও টেবিল পাতা হয়—এদিক থেকে দূরে পাহাড় আর নদীর খানিকটা দেখা যায় বলে।

কৈফিয়ৎটা নিরর্থক। পাহাড় ও নদী কেউ দেখে না আজকাল। একদিন হয়ত সত্যিই সেই দেখাটা ছিল বড় কথা, এখন আর তার কোনো অর্থ নেই। যা ছিল আনন্দ তা আজ অর্থহীন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

বারান্দায় এই চেয়ার পাতাটুকু থেকে এ বাড়ীর অনেক কিছুর, আরো গভীর কিছুর পরিচয় হয়ত পাওয়া যেতে পারে। এই কাহিনী সেইজন্যেই লেখা।

সবার আগে জগদীশবাবু এসে বসেন। নিচু ইজি চেয়ারটি তাঁর জন্যেই নির্দিষ্ট। চেয়ারের দু'ধারের হাতলে সুপুষ্ট হাত দু'টি ও সামনের টুলে পা দু'টি রেখে নিশ্চিন্ত আরামে হেলান দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে থাকা তাঁর পরম বিলাস। স্বেচ্ছায় পারতপক্ষে কথা তিনি বড় বলেন না। হঠাৎ দেখলে মনে হয় বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

সুরমা একটু পরে আসেন। শাড়িতে প্রসাধনে আলুথালু ভাব। আলুথালু ভাব বুঝি প্রকৃতিতেও। এসেই তিনি জিজ্ঞেস করেন,—"এর মধ্যেই ঘুমোলে নাকি?"

ইজি চেয়ারে জগদীশবাবু একটু নড়ে চড়ে জানান তিনি ঘুমোন নি।

সে প্রশ্নের জবাবের জন্যে সুরমার অবশ্য কোনো আগ্রহ নেই। অভ্যাস মতই প্রশ্নটা করেন, তারপর বেতের মোড়াটিতে বসতে গিয়ে উঠে পড়ে হয়ত বলেন,—"ওই যা, দোক্তার কৌটোটা ভুলে এলাম।"

জগদীশবাবু চক্ষুমুদ্রিত অবস্থাতেই বলেন,—"ডাক না চাকরটাকে।"

সুরমা আবার বসে পড়ে বলেন,—"তাকে যে আবার বাজারে পাঠালাম। যাও না গো তুমি একটু।"

ইজি চেয়ারে জগদীশবাবুর নড়া-চড়ার কোনো লক্ষণ না দেখে মনে হয় তিনি বোধ হয় শুনতে পান নি; অন্তত ওঠবার আগ্রহ তাঁর নেই।

কিন্তু সত্যি জগদীশবাবু খানিক বাদে বিশেষ পরিশ্রমে ইজি চেয়ার ছেড়ে উঠেছেন দেখা যায়। জগদীশবাবুর আরামপ্রিয়তা ও আলস্য যত বেশিই হোক স্ত্রীর স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি যত্ন ও দৃষ্টি তার চেয়ে প্রখর।

জগদীশবাবুকে কিন্তু কষ্ট করে আর যেতে হয় না। বারান্দার সিঁড়িতে ডাক্তারবাবুকে দেখতে পাওয়া যায়।

সুরমা বলেন,—"থাক থাক, তোমার আর যেতে হবে না। ডাক্তার, আমার দোক্তার কৌটোটা নিয়ে এসে একেবারে বসো। বিছানার ওপরই বোধ হয় ফেলে এলাম। আর ঘরের আলোটা বোধ হয় নিবিয়ে আসি নি। সেটা নিবিয়ে দিয়ে এস।"

আদেশ নয়, অনুরোধেরই মিষ্টতা আছে কণ্ঠস্বরে, কিন্তু সে মিষ্টতা খানিকটা যেন যান্ত্রিক।

মিষ্টতা সুরমার সব কিছুতেই এখনো বুঝি অনেকটা আছে—চেহারায়, কণ্ঠস্বরে, প্রকৃতিতে। বয়সের সঙ্গে শরীরের সে তীক্ষ্ণ রেখাগুলি দুর্বল হয়ে এলেও তাদের আভাস আলুথালু বেশ ও প্রসাধনে মধ্য দিয়েও পাওয়া যায়। সুরমার সৌন্দর্য এখনো একেবারে ইতিহাস হয়ে ওঠে নি। অবশ্য ইতিহাস তার আর একদিক দিয়ে আছে—কিন্তু সে কথা এখন নয়।

ডাক্তারবাবু ঘরের আলো নিবিয়ে, দোক্তার কৌটো নিয়ে এসে, টেবিলের ওধারে সুরমার সামনা-সামনি বসেন—নদী ও পাহাড়ের দিকে পিছন ফিরে। নদী ও পাহাড়ের দিকে কোনদিনই তাঁর চাইবার আগ্রহ ছিল না। বরাবর তিনি এই আসনটিতে এইভাবেই বসে আসছেন।

সন্ধ্যার অস্পষ্টতাতেও ডাক্তারবাবুকে কেমন অপরিচ্ছন্ন মনে হয়, শুধু পোশাকে ও চেহারায় নয়, তাঁর মনেও যেন একটা ক্লান্ত ঔদাসীন্য আছে সব ব্যাপারে। পোশাকের ত্রুটিটাই অবশ্য সকলের আগে চোখে পড়ে;—ঢিলে রঙচটা পেণ্টুলেনের ওপর গলাবন্ধ একটা কোট পরা। গলাটা কিন্তু বন্ধ হয় নি

বোতামের অভাবে। এই কোট পরেই সম্ভবত তিনি সারাদিন রুগী দেখে ফিরবেন। একধারের পকেট স্টেথিস্কোপের ভারেই বোধ হয় একটু ছিঁড়ে গেছে। গোটাকতক আলগা কাগজপত্র সেখান দিয়ে উঁকি দিয়ে আছে। মাথায় চুলের কিছু পরিপাট্যের চেষ্টা বোধ হয় সম্প্রতি হয়েছিল, কিন্তু সে নেহাৎ অবহেলার।

ডাক্তারবাবুর মুখের ক্লান্ত ঔদাসীন্যের রেখাগুলি শুধু তাঁর চোখের উজ্জ্বলতার দরুণই বুঝি খুব বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে নি। সমস্ত ঘুমন্ত নিষ্প্রাণ মানুষটির মধ্যে এই চোখ দু'টিই যেন এখানে জেগে আছে পাহারায়। কে জানে কি তাদের আছে পাহারা দেবার।

অনেকক্ষণ কোনো কথাই শোনা যায় না। সুরমার পানের বাটা সঙ্গে আছে এবং থাকে। তিনি সযত্নে পান সাজায় ব্যস্ত। জগদীশবাবু ইজি চেয়ারে নিশ্চল ভাবে পড়ে আছেন। ডাক্তারবাবু নিজের হাতের নখগুলো বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে সুরমার পান-সাজা শেষ হবার জন্যেই বোধ হয় অপেক্ষা করেন।

সুরমার পান সাজা শেষ হয়। সেটি মুখে দিয়েও তিনি কিন্তু খানিকক্ষণ নীরবে সামনের দিকে চেয়ে বসে থাকেন। তারপরে হঠাৎ এক সময়ে জিজ্ঞেস করেন,—"তোমার সে ফুলের চারা এল ডাক্তার ?"

জগদীশবাবু চোখ বুজে বলেন,—"সে চারা আর এসেছে! তার চেয়ে আকাশ-কুসুম চাইলে সহজে পেতে।"

সুরমা হেসে ওঠেন। বলেন,—"তুমি ডাক্তারকে অমন অকেজো মনে কর কেন বল দিকি ? সেবার আমাদের জলের পাম্পটা ডাক্তার না ব্যবস্থা করলে হ'ত ?"

ইজি চেয়ারের ভেতর থেকে ঘুমন্ত স্বরে শোনা যায়,—"তা হ'ত না বটে। অন্য কেউ ব্যবস্থা করলে হয়ত পাম্পে সত্যিই জল উঠত।"

তিনজনেই এ রসিকতায় হাসেন। এ বাড়ীর এটি একটি পুরাতন পরিহাস।

সুরমা বলেন,—"সত্যি, তুমি কি করে ডাক্তারি কর তাই ভাবি! লোকে বিশ্বাস করে তোমার ওষুধ খায় ?"

"খাবে না কেন, একবার খেলে আর অবিশ্বাসের সময় পায় না ত।"

স্বরমা হাসতে হাসতে পানের বাটা খুলে জিভে একটু চূণ লাগিয়ে বলেন,—"তোমার বাপু ডাক্তারের ওপর একটু গায়ের জ্বালা আছে। তুমি ওর কিচ্ছু ভালো দেখতে পাও না?"

"সেটা ওঁর চোখের দোষ, অনেক ভালো জিনিসই উনি দেখতে পান না।"—ডাক্তারের মুখে এতক্ষণে কথা শোনা যায়।

স্বরমা হেসে বলেন,—"তা সত্যি। চোখ বুজে থাকলে আর দেখবে কি করে।"

"চোখ বুজে থাকি কি সাধে। চোখ খুলে থাকলে কবে একটা কুরুক্ষেত্র বেধে যেত!"

স্বরমা ও জগদীশবাবুর উচ্চ হাসির মাঝে ডাক্তারবাবুর নিস্তব্ধতা যেন একটু বিসদৃশ ঠেকে। স্বরমার মুখের দিকে চেয়ে ডাক্তারের চোখে একটু বেদনার ছায়া এখনো দেখা যায় কি?

স্বরমা হাসি থামিয়ে বলেন,—"ওই যা, ভুলেই যাচ্ছিলাম, তোমায় এখন কিন্তু একবার উঠতে হবে ডাক্তার।"

"এখনি? কেন?"

"এখনি না উঠলে হবে না। দাদা কি সব পার্শেল করেছেন। স্টেশনে কাল থেকে এসে পড়ে আছে,—উনি একবার তবু সারাদিনে সময় করে যেতে পারলেন না। তোমায় এখন গিয়ে ছাড়িয়ে আনতেই হয়!"

ডাক্তারবাবু একটু ইতস্তত করে বলেন,—"কাল সকালে গেলে হয় না?"

"হয় না আবার! একমাস পরে গেলেও হয়! জিনিসগুলো খোয়া যাবার পর গেলে আরো ভালো হয়।"—স্বরমার কণ্ঠে মিষ্টতার চেয়ে এবার ঝাঁঝটাই বেশ স্পষ্ট।

"এক রাত্তিরেই খোয়া যাবে কেন?"—ডাক্তারবাবু একটু সঙ্কুচিতভাবেই বোঝাবার চেষ্টা করেন।

স্বরমা বেশ একটু উচ্চস্বরেই বলেন,—"তোমার সঙ্গে তর্ক করতে পারি না

বাপু! সোজাসুজি বলই না তার চেয়ে যে, পারবে না! তোমায় বলা-ই ঝকমারি হয়েছে আমার।"

ডাক্তারবাবু এবার অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে উঠে পড়েন,—"আমি কি যাব না বলেছি? ভাবছিলুম একটা রাত্তির বই ত না।"

"রাতটা কাটিয়ে গেলেই বা তোমার কি এমন সুবিধে। এমন কিছু কাজ ত আর হাতে নেই, চুপ করে বসেই ত থাকতে।"

সে কথা মিথ্যে নয়। ডাক্তার শুধু চুপ করে বসে থাকতেই এখানে আসেন। চুপ করে বসে আছেন আজ বহু বৎসর ধরে।

ডাক্তার টুপিটা তুলে নিয়ে একবার তবু বলেন,—"আসুন না জগদীশবাবু আপনিও! গাড়ীটা ত রয়েছে, একটু ঘুরে আসা হবে।"

জগদীশবাবুর আগে সুরমাই আপত্তি করেন,—"বেশ কথা! আমি একলা বসে থাকি এখানে তা হলে।"

ডাক্তার একটু হেসে বলেন,—"আরে! তুমিও এস না!"

"তার চেয়ে বাড়ি-সুদ্ধ পাড়া-সুদ্ধ সবাই একটা পার্শেল আনতে গেলেই হয়! সত্যি তুমি দিন দিন যেন কি হচ্ছ!"

ডাক্তার আর কিছু না বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যান।

"দিন দিন কি যেন হয়ে যাচ্ছ!" মোটরে চড়ে স্টেশনের দিকে যেতে যেতে ডাক্তার সে কথা ভাবেন কি? না বোধ হয়। ভাবনা ও আবেগের উদ্বেল সাগর বহুদিন শান্ত নিথর হয়ে গেছে। সে সব দিন এখন আর বোধ হয় মনেও পড়ে না। স্মৃতির সে সমস্ত পাতাও বুঝি অনেক তলায় চাপা পড়ে আছে। জীবনের একটি বাঁধা ছকে তিনি খাপ খেয়ে গেছেন সম্পূর্ণভাবে। আগুন কবে ভস্মশেষ রেখে একেবারে নিবে গেছে তা তিনি জানতেই পারেন নি।

আগুন একদিন সত্যিই জ্বলে উঠেছিল বই কি! কিন্তু সে যেন আর এক জনের কাহিনী, সে অমরেশকে তিনি শুধু দূর থেকে অস্পষ্টভাবে এখন চিনতে পারেন। তার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ তাঁর নেই!

ধূলি-ধূসর

একদিন একটি ছেলে সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে পরম দুঃসাহস ভরে দাঁড়াতে দ্বিধা করে নি।

মেয়েটি ভীতস্বরে বুঝি একবার বলেছিল, সুযোগ পেয়ে,—"তুমি এখানে চলে এলে!"

"আরো অনেক দূর যেতে পারতাম!"

"কিন্তু—?"

"কিন্তু এঁরা কি ভাববেন মনে করছ? তার চেয়ে তুমি কি ভাবছ সেইটেই আমার কাছে বড় কথা।"

"আমি ত···" মেয়েটি নীরবে মাথা নিচু করেছিল।

অমরেশ তার মুখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে বলেছিল,—"তোমার ভাববার সাহস পর্যন্ত নেই সুরমা!

সুরমা মুখ তুলে মৃদুস্বরে বলেছিল—"না।"

"সেই সাহস সৃষ্টি করতেই আমি এসেছি সুরমা। সেই সাহসের জন্যে আমি অপেক্ষা করব।"

সুরমা চুপ করেছিল। অমরেশ আবার বলেছিল,—"ভাবছ, কতদিন—এমন কতদিন অপেক্ষা করতে পারব? দরকার হলে চিরকাল। কিন্তু তা বোধ হয় হবে না।"

জগদীশবাবু বুঝি সেই সময়ে ঘরে ঢুকেছিলেন। তাঁর চেহারার এখনকার সঙ্গে তখনো বুঝি বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল না। বেঁটে গোল-গাল মানুষটি। শান্ত নিরীহ চেহারা। একেবারে নিচের ধাপ থেকে সংগ্রাম করে তিনি যে সাংসারিক সিদ্ধি বলতে লোকে যা বোঝে তাই লাভ করেছেন তাঁর চেহারায় তার কোনো আভাস নেই। দেখলে মনে হয় ভাগ্য তাঁকে চিরদিন বুঝি অযাচিত অনুগ্রহ করেই এসেছে। সুরমা-সম্পর্কে সে কথা হয়ত মিথ্যাও নয়।

তিনি ঘরে ঢুকে বলেছিলেন,—"এখনও ট্রেনের জামা-কাপড় ছাড়েন নি?

না না এখন ছেড়ে দাও স্বরমা। সারারাত ট্রেনের ধকল গেছে। স্নান করে খেয়ে-দেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিন আগে।"

অমরেশ হেসে বলেছিল,—"ছেড়ে না দেওয়ার অপরাধটা আমার—ওঁর নয়।"

জগদীশবাবু উচ্চস্বরে হেসেছিলেন। হাসলে তাঁকে এত কুৎসিত দেখায় অমরেশও ভাবতে পারে নি। স্বরমার পেছনে তাঁর এই হাস্য-বিকৃত মুখটা সে উপভোগ করেছিল বেদনাময় আনন্দে—

তারপর উঠে পড়ে বলেছিল,—"আচ্ছা এখন ওঠাই যাক।"

জগদীশবাবু সঙ্গে যেতে যেতে বলেছিলেন,—"বড় অসময়ে এলেন অমরেশবাবু! এই দারুণ গ্রীষ্মে এখানে কিছু দেখতে পাবেন না। বাইরে বেরুনই দায়।"

"সেটা দুর্ভাগ্য নাও হতে পারে! জগদীশবাবুর বিস্মিত দৃষ্টির উত্তরে আবার বলেছিল,—"তা ছাড়া গ্রীষ্ম ত একদিন শেষ হবে।"

"তখন আপনাকে পাচ্ছি কোথায়!" জগদীশবাবুর স্বরে বুঝি একটু সন্দেহের রেশ ছিল।

"পাবেন বই কি। হয়ত বড় বেশি পাবেন।"

অমরেশ ডাক্তার মিথ্যে বলেনি। সত্যই একদিন এই ধূলিমলিন দরিদ্র শহরের একটি রাস্তার ধারে অমরেশ ডাক্তারের সাইনবোর্ড ঝুলতে দেখা গেল।

জগদীশবাবু বলেছিলেন,—"বিলিতি ডিগ্রির খরচ উঠবে না যে ডাক্তার! এ জঙ্গলের দেশে আমাদের মত কাঠুরের পোষায় বলে কি তোমার পোষাবে?"

অমরেশ ডাক্তার হেসে বলেছিল—"কাঠের কারবার আর ডাক্তারি ছাড়া আর কি পোষাবার কিছুই নেই?"

অমরেশ ডাক্তারকে রোগীর ঘরে দেখতে পাওয়া যাক বা না যাক জগদীশবাবুর বাড়ির সরু বারান্দাটিতে প্রতিদিন তারপর দেখা গেছে।

"চেয়ারটা ঘুরিয়ে বোস ডাক্তার।"—জগদীশবাবু বলেছেন।

"কেন? আপনার ওই নদী আর পাহাড় দেখবার জন্যে? আপনার ট্রেডমার্ক পড়ে ওর দাম নষ্ট হয়ে গেছে।"

"মড়া কেটে কেটে মনটাও তোমার মরে গেছে ডাক্তার!"

জগদীশবাবু তারপরেই আবার জিজ্ঞেস করেছেন অবাক হয়ে,—"উঠলে কেন সুরমা?"

"আসছি।"—বলে সুরমা মুখ নিচু করে ভেতরে চলে গেছে।

অমরেশ ডাক্তার অদ্ভুতভাবে হেসে বলেছে,—"মেয়েরা কাটা-কাটির কথা সইতে পারে না, না জগদীশবাবু?"

জগদীশবাবু কোনো উত্তর দেন নি। গম্ভীর মুখে কি যেন তিনি ভাবছেন মনে হয়েছে।

অমরেশ ডাক্তার আবার বলেছে,—"ওইটুকু ওদের করুণা!"

জগদীশবাবু গম্ভীরভাবে বলেছেন,—"সেটুকু পাবারও সবাই যোগ্য নয়।"

ডাক্তারের আসা-যাওয়া গোড়ায় হয়ত এ বাড়ির উৎসাহ পায় নি। কিন্তু ক্রমে তা সয়ে গিয়েছে,—সহজ হয়ে এসেছে জগদীশবাবুর কাছেও বুঝি।

"কদিন আমায় জঙ্গলেই থাকতে হবে ডাক্তার। গুনতির সময়ে না থাকলে চলে না। দেখাশুনো কোরো। তোমায় অবশ্য বলতে হবে না।"

ডাক্তার হেসে বলেছে—"না, তা হবে না। আসতে বারণ করেও দেখতে পারেন!"

জগদীশবাবু হেসেছেন। সুরমাও হেসেছে, হাসলেই হয়ত তার মুখ লাল হয়ে ওঠে। লাল হবার আর কোনো কারণ নেই বোধ হয়।

কিন্তু সুরমাই একদিন তীব্র স্বরে বলেছে,—"আমি কিন্তু আর সইতে পারছি না!"

"পারবে না-ই ত আশা করি।"

"না না, তুমি এখান থেকে যাও। এমন করে নিজেকে ও আমাকে মেরে কি লাভ?"

"বাঁচবার পথ ত খোলা আছে এখনো!"

"সে পথ যখন আগে নেওয়া হয় নি···"

"সে অপরাধ ত আমার নয় সুরমা। তুমি তোমার নিজের মন জানতে না, আমি জানতাম না সুযোগের মূল্য! ভাগ্যের নিষ্ঠুর রসিকতাকে তাই বলে মেনে নিতে হবে কেন!"

"তুমি কি বলছ জান না! তা হয় না! তা হয় না!" সুরমার কণ্ঠ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে আবেগে।

"অপরাধের কথা ভাবছ? অপরাধ করার চরম দামও যার জন্যে দেওয়া যায় এমন বড় জিনিস কি নেই?"

"আমি বুঝতে পারি না! আমার ভয় হয়!"

"বুঝতে পারবে, সেই প্রতীক্ষাতেই ত আছি।"

প্রতীক্ষা একদিন বুঝি সার্থক হ'ল বলে মনে হয়েছে। জগদীশবাবুর কাঠের কারবারের জন্যে জমা নেওয়া বিস্তীর্ণ জঙ্গল সেদিন তারা দেখতে গেছল। অরণ্যের রহস্যঘন আবেষ্টনে সারাদিন রাজসূয় 'চড়িভাতি'র উত্তেজনাতেই কেটেছে। বিকেলের দিকে সবাই ঘুরতে বেরিয়ে পড়েছিল।

অমরেশ ও সুরমা পথহীন অরণ্যে সকলের থেকে কেমন করে আলাদা হয়ে গেছে। আলাদা হওয়াটা হয়ত সম্পূর্ণ দৈবাৎ নয়, অমরেশেরও তাতে হয়ত হাত ছিল।

সুরমা খানিকক্ষণ বাদে বলেছে,—"এ জঙ্গলে কিন্তু পথ হারাতে পারে!"

"পথ জঙ্গলে ছাড়াও হারানো যায়!"

সুরমা একটু অসহিষ্ণুভাবেই বলেছে,—"সব সময়ে তোমার এ ধরণের কথা ভালো লাগে না!"

"কোথাও তোমার ব্যথা আছে বলেই ভালো লাগে না। নিজের কাছে তুমি ধরা দিতে চাও না বলেই এসব কথা তোমার অসহ্য।"

সুরমা নীরবে খানিক দূর এগিয়ে গেছে। অরণ্যের পশ্চাৎ-পটে তার দীর্ঘ

সুঠাম দেহের গতিভঙ্গিতে বুঝি বনদেবীরই মহিমা ও মাধুর্য। সেটুকু উপভোগ করবার জন্যেই বুঝি খানিকক্ষণ নিঃশব্দে অমরেশ দাঁড়িয়ে থেকেছে। তারপর কাছে গিয়ে বলেছে,—"এ জঙ্গলে হারাবার বদলে পথ আমরা পেতেও পারি।"

সুরমা তবু নীরব।

হঠাৎ তার একটা হাত ধরে ফেলে অমরেশ বলেছে,—"চুপ করে থেকো না সুরমা। বলো, আজ তোমার অটলতার গৌরব আর নেই—আছে শুধু দুর্বলতার লজ্জা। এ সম্বল নিয়ে চিরদিন বাঁচা যায় না, বাঁচা উচিত নয় সুরমা।"

সুরমা প্রায়-অস্পষ্ট স্বরে বলেছে,—"আমি কি করতে পারি বলো!"

একটা কাটা গাছের গুঁড়ির ওপর পা দিয়ে অমরেশ বলেছে,—"এই কাটা গাছটা দেখছ সুরমা। কাঠের কারবারে এর একটা দাম মিলেছে। কিন্তু তার চেয়ে বড়, তার চেয়ে আসল দাম এর ছিল! তুমিও কারবারের কাঠ নও, সুরমা, তুমি অরণ্যের।"

সুরমাকে চুপ করে থাকতে দেখে অমরেশ আবার বলেছে,—"সহজ করে কথা আজ বলতে পারছি না বলে ক্ষমা কোরো সুরমা। মনের ভেতরেই আজ আমার সব জড়িয়ে গেছে।"

সুরমা অমরেশের আরো কাছে সরে এসেছে, বুকের ওপর মাথা নুইয়ে ধীরে ধীরে ধরা গলায় বলেছে,—"তুমি আমায় সাহস দাও।"

কিন্তু চলে যাওয়া তাদের তখন হয়ে ওঠেনি। বাধা এসেছে অপ্রত্যাশিত দিক থেকে। জগদীশবাবু হঠাৎ অসুখে পড়েছেন—গুরুতর অসুখ। সুরমা ও অমরেশ দিনরাত্রি বিনিদ্র হয়ে রোগ-শয্যার পাশে জেগেছে, আর শান্তভাবে প্রতীক্ষা করেছে মুক্তিক্ষণের। আর বেশিদিন নয়। এই তাদের শেষ পরীক্ষা, নূতন জীবনের এই প্রথম মূল্যদান।

জগদীশবাবু ভালো হয়ে উঠেছেন, তবু অপেক্ষা করতে হয়েছে, আর কিছুদিন, আর কয়েকটা দিন! ছোট-খাট বাধা, বাঁধা-ঘাটের নোঙর একেবারে তুলে

ফেলতে সুরমার সামান্য একটু বিহ্বলতা। একটু সময় তাকে দেওয়া যেতে পারে, —নিজের ভেতর থেকে বল পাওয়ার সময়। অমরেশ কোথাও এতটুকু জোর খাটাতে চায় না, সব শিকড় আপনা থেকে আলাগা হয়ে আসুক, সব বন্ধন খুলে যাক। অসীম তার ধৈর্য।

অমরেশ ডাক্তার অপেক্ষা করেছে—কিছু দিন—অনেক দিন অপেক্ষা করেছে।

—বড় বেশি দিন অপেক্ষা করেছে।

ধীরে ধীরে কখন আগুন গিয়েছে নিবে। কখন আর-বছরের পাপড়ির মত সে ম্লান শুকনো বিবর্ণ হয়ে গেছে,—তারা সবাই বিবর্ণ হয়ে গেছে। বিবর্ণ আর সুলভ আর সাধারণ। অভ্যাসের ছাঁচে তারা বিদ্ধ হয়ে গেছে, জীর্ণ মলিন হয়ে গেছে সংসারের ধূলায়।

সবচেয়ে মলিন বুঝি ডাক্তার, সবচেয়ে মলিন আর ক্লান্ত। আগুন তার মধ্যে অমন লেলিহান হয়ে জ্বলেছিল বলেই সবার আগে তার সব পুড়ে ছাই হয়েছে। ডাক্তার তার নির্দিষ্ট চেয়ারে এসে এখনো রোজ বসে, নদী ও পাহাড়ের দিকে পিছন ফিরে! কিন্তু সে শুধু অভ্যাস। ডাক্তার স্টেশনে পার্শেল খালাস করতে ছোটে, সে শুধু দুর্বল আজ্ঞাবাহিতা।

কয়েকটা দিন এমনি করিয়াই কাটিয়া যাইতেছে। ভূপতি বাড়ি আসে অনেক রাত করিয়া, দরজায় দুইটা মৃদু টোকা দেয়, দরজা খুলিবার পর ঘরে গিয়া ঢোকে নীরবে। জামা কাপড় ছাড়িয়া হাত মুখ ধুইবার পর ঘরে খাবার আসনে আসিয়া বসে, খাবার দাবার সামনেই সাজান। আহার শেষ করিয়া নিঃশব্দে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়ে। সারাক্ষণের মধ্যে বিনতির সহিত একটা কথাও বিনিময় হয় না। একই বাড়ীতে যে দুইটি লোক পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি বাস করিতেছে এবং আজ সাত বৎসর ধরিয়া আসিতেছে তাহার কোন পরিচয় তাহাদের ব্যবহারে নাই। তাহাদের মধ্যে যেন অসীম মহাদেশ ব্যবধান। দুই হাত মাত্র তফাতে বড় তক্তপোষটায় যাহারা রাত্রি যাপন করে তাহাদের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ বলিয়া বুঝি এতখানি সুদূরে তাহারা পরস্পরের কাছ হইতে সরিয়া যাইতে পারিয়াছে। কিন্তু শুধু সুদূর বলিলে ইহাদের মধ্যকার ব্যবধান বুঝি কিছুই বোঝান যায় না।

সকালে উঠিয়া ভূপতি নিজেই বাজারে চলিয়া যায়। বাজার হইতে ফিরিয়া মোটটা নামাইয়া দেয় রান্নাঘরের ধারে। আহারের পর নিজের ঘরে গিয়া অফিস যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়।

সংসারের কাজ কিন্তু ঠিক নিয়ম মত সুশৃঙ্খলভাবেই চলিতেছে। কোথাও এতটুকু গোল নাই। বাহির হইতে চেষ্টা করিলেও সেখানে কোন অসঙ্গতি কেহ দেখিতে পাইবে না।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার স্তব্ধতাটা সেই জন্যই যেন আরও ভয়ঙ্কর। সাধারণ মান-অভিমানের ক্ষণিক পালা ইহা নয়, ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধে আবদ্ধ এই দুইটি নরনারীর অসাধারণ এই বিমুখতার হেতু তাহাদের অতীত ইতিহাসেও পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। বাহিরের ইতিহাসে সব কিছু কি ধরা পড়ে!

বিবাহ হইয়াছিল নিতান্ত সাধারণ ভাবে। বাড়িঘর আত্মীয় স্বজন না থাক,

উপার্জনক্ষম ও স্বাস্থ্যবান বলিয়া বলিয়া ভূপতিকে কন্যাদান করিতে পারিয়া বিনতির বাপ মা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। শুধু স্বামী ও শাশুড়ীকে লইয়া বিনতিকে সংসার করিতে হইবে। দা-দেইজি না থাকায় একরকম ভালই থাকিবে। ছেলেটি অবশ্য কেমন একটু···

কেমন একটু যে কি তা অবশ্য তাঁহারা ঠিক স্পষ্টভাবে নিজেরাই বুঝিতে পারেন নাই। তবু খটকা লাগাও আশ্চর্য। সত্যিই ভূপতিকে দেখিয়া বা তাহার সহিত আলাপ করিয়া খুঁত ধরিবার কিছু পাওয়া যায় না। বিনতির বাপ-মায়ের সচেতন মনে নয়, তাহার চেয়ে গভীর কোন স্তরে যেন সন্দেহের ছায়া দেখা দিয়াছিল। সে ছায়াকে তাঁহারা শেষ পর্যন্ত আমল দেন নাই, না দেওয়াই স্বাভাবিক। বিনতি তখন চোদ্দ পোনেরো বছরের লাজুক ভীরু একটি নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতির মেয়ে। ফুলশয্যার রাতে নিজের শরীরের তুলনায় অনেক বড় ভারী জামা কাপড়ের বোঝায় আড়ষ্ট ও জড় সড় হইয়া শয্যাপ্রান্তে গিয়া বসিয়াছিল।

রাত তখন অনেক। নিমন্ত্রিতদের ভোজনের হাঙ্গামা চুকিবার পর ভূপতি আসিয়া আগেই শয্যার উপর মাথার নীচে হাত রাখিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। আত্মীয় স্বজনের অভাবে পাড়া প্রতিবেশীরাই বিনতিকে সাজাইয়া আচার অনুষ্ঠান পালন করাইয়া ঘরে পাঠাইয়া দিয়াছে।

বিনতি ঘরে ঢুকিতে ভূপতি একবার ফিরিয়া চাহিয়াছিল। তাহার পর সে নিজে উঠিয়া সমবেত মেয়েদের কৌতুকহাস্য উপেক্ষা করিয়া সশব্দে দরজাটা বন্ধ করিয়া আবার বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।

বিছানায় উঠিবার সময় পাশের বালিশটা বুঝি অসাবধানে পা লাগিয়া মাটিতে তখন পড়িয়া গিয়াছে। বিনতি নিজের অজ্ঞাতসারে স্বাভাবিক কর্তব্য-বোধেই সেটা তুলিয়া বিছানায় আবার রাখিয়া দিতেই ভূপতি পা দিয়া সেটা মেঝেয় ফেলিয়া দিল।

বিস্মিত ও একটু ভীতভাবেই বিনতি স্বামীর দিক ফিরিয়া চাহিয়াছিল। না, ভয় করিবার কিছু নাই! ভূপতি হাসিতেছে নিঃশব্দে।

এবারে কৌতুক অনুভব করিয়া বিনতি নিজের হাসিটুকু বুঝি গোপন করিতে পারে নাই। মাথার কাপড়টা ভাল করিয়া দিয়া আবার সে বালিশটা মেঝের উপর হইতে তুলিয়া রাখিতে যাইতেছিল, এমন সময় ভূপতি আবার পা ছুড়িল! বালিশটা বিনতির হাত হইতে পড়িয়া ত গেলই, আর একটু হইলে বুঝি আঘাত তার হাতেও লাগিত।

বিনতি এবারে ঠিক কৌতুকটা উপভোগ করিতে পারিল না।

কিন্তু সচকিত হইয়া সে হাত সরাইয়া লইতেই ভূপতির উচ্চহাসি শোনা গেল। ভূপতি তখন বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছে।

বিনতিও হাসিল কিন্তু এবার আর বালিশ তুলিবার চেষ্টা করিল না। খাটের একবারে শেষপ্রান্তে দেয়ালের কাছে সরিয়া দাঁড়াইল।

ভূপতি খানিক তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—"কই বালিশটা তুললে না?"

বিনতি একবার তাহার দিকে সকৌতুক ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকাইয়া মাথা নত করিল। ঘোমটার ভিতর হইতে তাহার মুখ আর দেখা যায় না।

"তোলো বালিশটা।"

মুখ নীচু করিয়াই বিনতি মাথা নাড়িয়া জানাইল, সে তুলিবে না। তাহার পর ফিক্ করিয়া হাসিয়াও ফেলিল।

ভূপতি বিছানার উপর তাহার দিকে সরিয়া বসিল এবার। তারপর তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল,—"বালিশটা কিন্তু না তুললে হবে না।"

স্বামী তাহাকে এই প্রথম স্পর্শ করিয়াছেন।

বিনতি তখন ভয়ে আনন্দে লজ্জায় কেমন এক রকম হইয়া গিয়াছে। জড়সড় হইয়া সরিয়া গিয়া দুর্বলভাবে হাতটা একটু ছাড়াইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। তাহার শরীরে যেন আর এতটুকু জোর নাই—সমস্ত অবশ হইয়া আসিতেছে, অপূর্ব আনন্দ শিহরণে।

তাহারই ভিতর কানে আসিয়া বাজিল,—"তোলো বলছি।"

বিনতি আবার সচকিত হইয়া মুখ তুলিয়া স্বামীর দিকে না তাকাইয়া পারিল

না। আশ্চর্য! গলার স্বর যেন রূঢ় বলিয়াই মনে হইয়াছিল কিন্তু মুখে তাহার কেন আভাসই নাই! ভূপতি হাসিতেছে।

বিনতি সাহস পাইয়া অস্ফুট লজ্জাজড়িত স্বরে বলিল,—"আর ফেলে দেবে না ত ?"

"আগে তোলো ত।"

স্বামীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পদ্ধতিটা একটু অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইলেও বিনতি সমস্ত ব্যাপারে একটু অস্বাভাবিক কৌতুকপ্রিয়তার বেশী আর কিছু দেখিতে পায় নাই। দেখিবার ছিল কি কিছু ?

সে বালিশটা তাড়াতাড়ি তুলিয়া বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া মৃদুস্বরে বলিয়াছিল,—"হয়েছ ত !"

কিন্তু সে পালা তখনও শেষ হয় নাই। বিনতিকে আর একবাব বালিশটা কুড়াইতে হইয়াছিল। কৌতুকের চেয়ে বিস্ময় তাহার বুঝি মনে তখন প্রবল।

অস্বাভাবিক হইলেও অত্যন্ত অর্থহীন একটা ঘটনা। বিনতির মনে তাহার স্মৃতিও থাকিবার কথা নয়। কিন্তু যত দিন গিয়াছে বিনতির মনে হইয়াছে যে প্রথম রাত্রির ব্যাপারটিতেই বুঝি তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের ইঙ্গিত ছিল।

সংসারে গোড়া হইতেই একটু খিটি মিটি বাধিয়াছে। গায়ে মাখিবার মত এমন কিছু হয়ত নয়। কিন্তু তাহার ভিতর স্বামীর ব্যবহারের যে পরিচয় পাইয়াছে তাহা তাহার অনুকূল হইলেও বিনতির মনে কোথায় যেন একটা অহেতুক আশঙ্কা তাহাতে জাগিয়া উঠিয়াছে।

শাশুড়ী ওই একটি মাত্র ছেলেকে লইয়া অজে কুড়ি বৎসর হইল বিধবা হইয়াছেন। ভূপতির বয়স তখন পাঁচ বৎসর। পরের সংসারে আশ্রিত হিসাবে মানুষ হইয়া একদিকে ঔদাসীন্য এমন কি নির্যাতন ও অন্যদিকে মায়ের অতিরিক্ত অন্ধ স্নেহ ও আদর পাইয়া ভূপতি হয়ত ঠিক স্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার প্রকৃতি প্রশ্রয় ও পীড়নের মাঝে অক্ষম বিদ্রোহে বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এ কথা মানিলেও তাহার সব অদ্ভুত আচরণের অর্থ পাওয়া যায় না।

ধূলি-ধূসর

শাশুড়ী বিনতির বিবাহের বছর দুই বাদেই মারা গিয়াছেন। আগেকার কথা জানা নাই কিন্তু জীবনের শেষ দুই বৎসর তিনি বড় কষ্ট পাইয়াছেন এবং সে কষ্টের কারণ বিনতি নয়।

শাশুড়ী-বধূর ছোট খাট গরমিল হয়ত আপনা হইতেই ঘুচিয়া যাইতে পারিত। শাশুড়ীর দিক হইতে স্নেহ না থাক বিদ্বেষ ছিল না, বিনতিরও ভালবাসা না থাক শ্রদ্ধা ও কর্তব্য বোধ ছিল। কিন্তু মাঝে হইতে ভূপতি সমস্ত গোলমাল করিয়া দিয়াছে।

রান্না ঘরে সামান্য কি একটা কাজের ত্রুটি লইয়া বিনতি হয়ত একটু বকুনি খাইয়াছে শাশুড়ীর কাছে। ব্যাপারটা এমন কিছুই নয়। স্বামীকে তাহা নিজে হইতে বিনতি জানাইবার কথা কল্পনাও করে নাই।

অফিসে যাইবার সময় খাইতে বসিয়া ভূপতি হঠাৎ বলিয়াছে,—"আর একটা ঝি না রাখলে চলছে না, কি বল মা?"

মা ছেলের আহারের সময় বরাবর কাছে আসিয়া বসেন। হাতের পাখাটা থামাইয়া একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—"কেন! ঝি ত আমাদের দরকার নেই!"

ভূপতি খানিকক্ষণ কোন কথা বলে নাই। নিঃশব্দে আহার করিতে করিতে হঠাৎ আবার বলিয়াছে,—"একটাতেই ঠিক চলছে কি?"

মা ঠিক অর্থটা না বুঝিলেও ইঙ্গিতটুকু বুঝিয়াই গুম হইয়া গিয়াছেন।

ভূপতি আবার বলিয়াছে,—"না হয় আর একটা বিয়েই করি! এমনত কত লোক করে!"

মায়ের হাতের পাখা থামিয়া গিয়াছে। ক্ষোভে দুঃখে চোখে জলও আসিয়াছে বুঝি।

ভূপতি তবু কিন্তু ক্ষান্ত হয় নাই। বলিয়াছে,—"এ যুগের ছেলেরা ত আর মায়ের সম্মান রাখে না। মাতৃভক্তির জন্যে স্ত্রী-ত্যাগ করলে একটা কীর্তিও থাকবে।"

মা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিয়াছেন,—"আমি ত বৌকে কিছু বলিনি বাবা!

ঘরসংসার করতে হ'লে একটু শিক্ষা দিতে হয়। বৌ যদি তাতে রাগ করে, না হয় আর কিছু বলব না।"

লজ্জায় বিনতির মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছে। শাশুড়ী নিশ্চয় ভাবিয়াছেন যে সে-ই স্বামীর কাছে ভর্ৎসনার কথা লাগাইয়াছে।

স্বামীকে রাত্রে নির্জনে সে একবার অত্যন্ত ক্ষুণ্ণভাবে বলিয়াছে,—"ছি, ছি, তুমি মাকে অমন করে কালকে কেন বলতে গেলে বল ত! আমি কি তোমায় কিছু বলেছি?"

ভূপতি হাসিয়াছে,—"না, আর একটা বিয়ে করতে তুমি বলনি বটে!"

"তাও তুমি পার!"—বিনতির মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে।

ভূপতি আবার তেমনি হাসিয়া বলিয়াছে,—"আমার শক্তিতে তোমার অগাধ বিশ্বাস আছে দেখে সুখী হলাম।"

ইহার পর আর এ সম্বন্ধে কোন কথা বলা বিনতির নিরর্থক মনে হইয়াছে।

কিন্তু একটা ঘটনা তাহাদের সংসারিক জীবনে ওই একটিই নয়। সংসারের মসৃণ সামঞ্জস্যকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিশৃঙ্খল বিকৃত করিয়া তোলায় ভূপতির যেন অহেতুক একটা আনন্দ আছে। তাহার চেয়েও বেশী—ছোট খাট নিষ্ঠুরতাই যেন তার বিলাস।

সংসারের খরচপত্র আগে মা-ই করিতেন। টাকাকড়ি তাঁহার হাতেই থাকিত। মাস শেষ হইবার পরও টাকা না পাইয়া মা একদিন আসিয়া বলিয়াছেন,—"হাতে যে আর কিছু নেই রে! মাইনে পেতে এবারে এত দেরী যে!"

ভূপতি খবরের কাগজ পড়িতেছিল। মুখ না তুলিয়াই বলিয়াছে,—"দেরী কোথায়!"

"আজ সাত দিন হয়ে গেল, দেরী নয়!"

"মাইনে ত অনেক দিন পেয়েছি। ও দেওয়া হয়নি বুঝি তোমায়। আচ্ছা দেবখন।"

"আমার যে আজই দরকার, মাসের চাল ডালগুলো আনিয়ে নিতে হবে।"

ভূপতি আবার খবরের কাগজে মনোনিবেশ করিয়া বলিয়াছে,—"আচ্ছা ওর কাছেই দেবখন। চেয়ে নিও যা দরকার।"

আঘাত হিসাবে এইটুকুই যথেষ্ট। মা একেবারে মর্মাহত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিলেন। নির্বিকার নিষ্ঠুরতা এতদূর পর্যন্ত বুঝি কোনরকমে বোঝা যায়। ভূপতি কিন্তু তাহার পরও কাগজটা সরাইয়া বলিল,—"বৌ-এর কাছে হাত পেতে নিতে আবার মান যাবে না ত?"

মা আর সহিতে পারেন নাই। পারা সম্ভবও বুঝি নয়। হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে যা নয় তাই বলিয়া মনের সমস্ত রুদ্ধবেদনা ও ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, 'যে মা বলিয়া সম্মান না করুক, পঁচিশ বৎসর ধরিয়া তিনি যে দুঃখ ভোগ করিয়া তাহাকে পালন করিয়াছেন তাহার পুরস্কার কি এই!'

ভূপতি তবু হাসিয়া বলিয়াছে,—"ছেলে-বৌ-এর উপর রাজত্ব করবার লোভেই তাহলে এত কষ্ট করে মানুষ করেছিলে!"

মা একথার উত্তর দিবার ভাষাই বুঝি খুঁজিয়া পান নাই। সেই দিন হইতে তিনি নিজেকে সমস্ত সংসার হইতে সরাইয়া লইয়াছেন। বিনতির করিবার কিছু ছিল না। শাশুড়ী মনে মনে তাহাকেও যে দোষী ভাবিবেন ইহা স্বাভাবিক। তাঁহার সন্তোষ-বিধানের দুর্বল চেষ্টারও তাই তিনি ভুল অর্থ করিয়াছেন। বিনতি শেষ পর্যন্ত হাল ছাড়িয়া দিয়াছে।

স্বামীকে কিন্তু তখন হইতেই বিনতি ভয় করে। স্বামীর এ সমস্ত ব্যবহার সত্যই দুর্বোধ্য। স্ত্রীর প্রতি উৎকট ভালবাসার পরিচয় যে ইহা নয়—তাহা বিনতি ভাল করিয়া জানে। তবে এই সাধারণ হৃদয়হীনতার মূল কোথায়।

বিনতি বুঝিতে পারে না। বুঝিতে পারে নাই বলিয়াই তাহার সমস্ত মনে গভীর অর্থহীন একটা আশঙ্কার ছায়া জাগিয়া থাকে। সর্বদাই একটা অস্বস্তি একটা নামহীন অস্পষ্ট আতঙ্ক যেন সে অনুভব করে স্বামীর সংস্পর্শে।

শাশুড়ীর মৃত্যুর পর তাহা যেন আরো গভীর হইয়া উঠিল। সংসারে আর কেহ নাই। স্বামীর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে খুলিয়া ধরিতে পারিলে এই নিঃসঙ্গতাই মধুর হইয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু খুলিয়া ধরা দূরে থাক, ক্রমশঃ

তাহাদের বন্ধন যেন যেন আরও আড়ষ্ট হইয়া পড়িতেছে। অদৃশ্য প্রাচীর কে যেন গড়িয়া তুলিতেছে—দু'জনের মাঝখানে। নিজের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আবদ্ধ হইয়া থাকার দরুণ বুঝি বিনতির অদ্ভুত একটা পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। সে ভীরু সরল মেয়েটি বিদায় লইয়াছে অনেক দিন আগেই। বিনতির প্রকৃতি ক্রমশঃ রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে শিথিলতা আসিয়াছে তাহার সব কাজে। সংসারের কাজ সে নিয়মিত করিয়া যায় কিন্তু তাহাতে যেন আর গা নাই। নিজের সম্বন্ধে সে উদাসীন। ভবিষ্যৎ তাহার কাছে অন্ধকার, সেজন্য সে মাথাও ঘামায় না। কোনমতে দিনটা কাটানই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

রাত্রে অবশ্য তার ঘুম আসিতে চায় না। ঘুমাইলেও সে সচকিত ভাবে ক্ষণে ক্ষণে জাগিয়া উঠে।

কিন্তু তাহাদের জীবনে যে গাঢ় ভয়াবহ ছায়া নামিয়া আসিয়াছে, সত্যই ভূপতি কি তাহার হেতু? হৃদয়হীন নির্বিকার মানুষ ত সংসারে বিরল নয়। তাহাদের সহিত ঘরকরা সুখের নয়, সহজও নয়, কিন্তু সম্ভব। ভূপতির ভিতর কি নির্বিকার হৃদয়হীনতারও বেশী কিছু আছে!

'বোঝা যায় না কিছুই'। বাহির হইতে দেখিতে গেলে তাহার কিছু মাত্র পরিবর্তন হয় নাই। যে অদৃশ্য প্রাচীর পরস্পরের মধ্যে বিনতি সারাক্ষণ অনুভব করে, ভূপতির কাছে তাহার অস্তিত্বই নাই বলিয়া মনে হয়।

বরাবর যেমন ছিল সে এখনও তেমনি আছে। বিনতির সহিত স্পষ্ট কোন দুর্ব্যবহার সে করে না তাহাকে শাসন করে না, তাহার সংসার-পরিচালনার স্বাধীনতায় পর্যন্ত বাধা দেয় না এতটুকু।

স্ত্রীর সহিত সে যে আলাপ করে তাহাকে সহজ বলিয়া মনে হয়। কণ্ঠও তাহার একান্ত সরল।

"তোমার চুল যে সব উঠে যাচ্ছে!"

বিনতি ধোপার বাড়ীর ফেরত কাপড়গুলা পাট করিয়া তোরঙ্গে তুলিতেছিল উত্তর দেয় নাই।

ভূপতি আবার বলিয়াছে,—"কি ভাগ্যি তোমার কপাল ছোট। চওড়া কপালের ওপর চুল উঠে গেলে মেয়েদের ভারী খারাপ দেখায়।"

বিনতি এবারে রুক্ষস্বরে বলিয়াছে,—"পোড়াকপালে উঠলে দেখায় না।"

"তুমি আয়নায় দেখেছ?" ভূপতি হাসিয়া উঠিয়াছে।

"আয়নায় দেখবার দরকার নেই, আমি জানি।"

"তা হলেও চুল থাকলে পোড়াকপাল ঢাকা থাকে। কালই একটা ভালো তেল আনতে হবে।"

কাপড়গুলো তুলিয়া তোরঙ্গ বন্ধ করিয়া বিনতি বলিয়াছে,—"দরকার নেই আমার। আমার চুল উঠলে ক্ষতি নেই।"

"একটু আছে যে। চুল উঠে গেলে সিঁথিতে যে সিঁদুর পড়বে না ঠিক মত। সেটাও ত দরকার, কি বল?"

বিনতি চুপ করিয়াছিল।

ভূপতি আবার বলিল,—"কালই একটা তেল আনব।"

ভূপতি তাহার পরদিন সত্যই একটা তেল লইয়া আসিয়া বলিল,—"এই নাও, রোজ ঠিকমত মেখো।"

মাথার তেলের শিশি এত ছোট দেখিয়া বিনতি না জিজ্ঞাসা করিয়া পারে নাই,—"এত ছোট শিশি যে; এত একবার মাখলেই ফুরিয়ে যাবে।"

ভূপতি ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"ওটা মাথার নয়, কপালে লাগাবার জন্যে, পড়ে দেখোনা পোড়াঘায়ে ধন্বন্তরি বলে লিখেছে।"

অতীত যুগের সে নিরীহ লাজনম্র মেয়েটি কি করিত বলা যায় না, কিন্তু এখনকার বিনতি নিজেকে আর সম্বরণ করিতে পারে নাই। একেবারে যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া সে সবলে শিশিটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে।

মেঝের উপর ছড়ানো তেল ও কাঁচের ভাঙ্গা টুকরার দিকে চাহিয়া ভূপতি শুধু বলিয়াছে,—"তোমার হাতের তাগ নেই।"

তাহার কণ্ঠস্বরে এতটুকু বিস্ময় বা উত্তেজনার আভাস নাই।

স্বামী-স্ত্রীর আলাপ এমনি ধরণের। ভূপতি কোনদিন হয়ত সকাল বেলা খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে স্ত্রীকে ডাকিয়া বলে,—"শুনে যাও।"

বিনতি কি একটা কাজে ভাঁড়ারে যাইতেছিল, দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলে,—"কেন ?"

"শুনে যাও না।"

বিনতি কাছে আসিলে খবরের কাগজের একটা জায়গা তাহাকে দেখাইয়া ভূপতি বলে,—"পড়োনা, ভারী মজার খবর একটা।"

"আমার সময় নেই এখন।"—বলিয়া বিনতি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে ভূপতি হঠাৎ তাহার আঁচলটা ধরিয়া ফেলিয়া বলে,—"খুব আছে, এইটুকু পড়তে আর কতক্ষণ !"

বিনতি অগত্যা কাগজটা হেলাভরে হাতে তুলিয়া লয়। কিন্তু পড়িতে পড়িতে তাহার মুখ অন্ধকার হইয়া ওঠে। নিঃশব্দে কাগজটা স্বামীর কোলের উপর নামাইয়া দিয়া কঠিন মুখে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে ভূপতি তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া বলে,—"ভারী মজার,—না ?"

বিনতি স্বামীর চোখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া গম্ভীর মুখে বলে,—"হুঁ !"

"পৃথিবীতে কাউকেই বিশ্বাস নেই। কিছুই আশ্চর্য নয়, কি বলো ?"

'না বলিয়া বিনতি হাতটা ছাড়াইয়া এবার চলিয়া যায়।

ভূপতি তখনকার মত আর কিছু বলে না। কিন্তু খাবার সময়, প্রথম ভাতের গ্রাস মুখে তুলিতে গিয়া হঠাৎ নামাইয়া রাখিয়া বলে,—"এমনি নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে সে লোকটাও ত মুখে ভাত তুলেছিল! সারাদিন খেটেখুটে হায়রাণ হয়ে এসেছে, ক্ষিধেয় সমস্ত অন্ধকার দেখছে। কেমন করে বেচারা জানবে সেই অন্ধকারই খানিকবাদে চিরদিনের মত নেমে আসবে। কেমন করে জানবে তার জীবনের ওই শেষ গ্রাস।"

বিনতি বুঝি একটু শিহরিয়া ওঠে। সেদিকে একবার চাহিয়া ভূপতি বলিয়া যায়,—"তার স্ত্রী নিশ্চয়ই তখনও তার সামনে বসে। স্বামীর জন্যে অনেক যত্নে, অনেক পরিশ্রমে সে অমন খাওয়ার আয়োজন করেছে—ক্ষিদে শুধু মিটবে না,

জীবনের ক্ষিদে একেবারে শেষ হয়ে যাবে। কেমন করে স্বামী সে গ্রাস মুখে তোলে তাকে দেখতে হবে ত!"

ভূপতির মুখে একটু হাসির রেখা যেন দেখা দেয়। সে আবার বলে,—"তার স্ত্রীর সেই সাগ্রহে বসে থাকা আমি যেন দেখতে পাচ্ছি। অমন সে কত দিন কত রাত আগেও বসেছে, কিন্তু এত আগ্রহ নিয়ে বোধ হয় না।"

হঠাৎ বিনতি সেখান হইতে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

কিন্তু ভূপতিরও একটু পরিবর্তন বুঝি দেখা দেয়। বিনতি কিছু না বলিলেও নিজে হইতে সে একদিন বাড়ীতে একটি ঝি রাখার বন্দোবস্ত করিয়াছে। একদিন অফিস ফেরত গোটাকতক রঙীন ছিটের কাপড় আনিয়া নিজেই বিনতিকে বলিয়াছে,—"সস্তায় পেয়ে গেলুম। বহর বড় কম, তবে ছোট পেনি কটা হ'তে পারে।"

বিনতি সন্তান-সম্ভবা। শরীর তাহার অত্যন্ত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। গায়ে যেন রক্ত নাই, হাত পা শীর্ণ।

সন্তান লাভের কল্পনায় আনন্দ হয়ত তাহারও আছে কিন্তু উৎসাহ নাই। উৎসাহ তাহার আর কিছুতেই নাই। হয়ত ইহা তাহার ক্লান্ত দুর্বল শরীরেরই প্রতিক্রিয়া, হয়ত তাহার চেয়েও বেশী কিছু। হয়ত ভাবী সন্তান সম্বন্ধেও তাহার আশঙ্কা আছে। ভূপতিরই ছায়া যদি তাহার মধ্যে দেখা দেয়! তেমনি অপরিচিত, ভয়ঙ্কর দূরত্ব যদি থাকে তাহার মধ্যে! মাতৃত্ব দিয়াও যদি তাহাকে আপন করা না যায়! বিনতি সে কথা ভাবিতে চায় না, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবার চেষ্টা করে।

ভূপতির চোখে মুখে কিন্তু কেমন যেন একটু উজ্জ্বলতা দেখা দিয়াছে। একদিন সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল,—"এই বিছানাটুকু পেতে এত হাঁফাচ্ছ কেন?"

বিনতি উত্তর দিল না। সে সত্যই ক্লান্ত, অত্যন্ত দুর্বল। কোন রকমে মনের জোরে সে যেন খাড়া হইয়া কাজ করিয়া বেড়ায়, তাহার সমস্ত শরীর কিন্তু

প্রতিবাদ করে। একবার শুইলে তাহার যেন আর উঠিতে ইচ্ছা করে না। মনে হয় ঘুম যদি মৃত্যুর মত গাঢ় হইয়া নামে তাহা হইলেও যেন আর কিছু আসে যায় না।

ভূপতির সন্তান যেন এখন হইতেই তাহার বিরুদ্ধে শত্রুতা সুরু করিয়াছে। তাহার সমস্ত প্রাণশক্তি সে নির্মমভাবে শোষণ করিয়া লইবে।

ভূপতি একদিন হঠাৎ ডাক্তার ডাকিয়া আনিল নিজে হইতেই। বিনতি ডাক্তার দেখাইতে চায় না কিন্তু তবু আপত্তি টিকিল না। ডাক্তার ওষুধপত্র লিখিয়া দিয়া গেল। সাবধানে থাকিবার জন্য উপদেশ দিয়া গেল অনেক।

"ভয়, হ্যাঁ ভয় একটু আছেই বই কি!" ডাক্তার ভূপতির জিজ্ঞাসার উত্তরে তাহাই বলিয়া গিয়াছে।

ডাক্তার চলিয়া যাইবার পর বিনতি অদ্ভুতভাবে হাসিয়া বলিল,—"ডাক্তার ডাকতে গেছলে কেন? আমি মরব না, ভয় নেই।"

ভূপতি উত্তর দিয়াছিল,—"বলা যায় না, তুমি এখন তা পার।"

বিনতি মরে নাই, কিন্তু মৃত্যুর একেবারে প্রান্তে উপনীত হইয়া একটি মৃত সন্তান প্রসব করিয়াছে।

নিরাপদে ভালোভাবে প্রসব যাহাতে হয় সেজন্য ভূপতি স্ত্রীকে হাসপাতালে রাখিয়াছিল; মৃত সন্তান প্রসব করিবার পর বিনতির নিজের জীবন লইয়াই অনেকক্ষণ টানাটানি চলিয়াছে। সেটাকে খানিকটা সামলাইবার পর ভূপতি স্ত্রীকে দেখিবার অনুমতি পাইয়াছিল। যে ডাক্তারের উপর বিনতির ওয়ার্ডের ভার ছিল তিনি বলিয়াছিলেন,—"এ যাত্রায় খুব আপনার বরাত জোর মশাই। কেটে ছিঁড়ে ছেলেটাকে সময় মত না বার করলে স্ত্রীকে আপনার বাঁচান যেতো না।"

অদ্ভুতভাবে ডাক্তারের দিকে তাকাইয়া ভূপতি বলিয়াছে,—"আপনাকে আমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত!"

ডাক্তারই কেমন যেন বিব্রত হইয়া গিয়া বলিয়াছেন,—"না, ধন্যবাদ কিসের! এত আমাদের কর্তব্য!"

"কর্তব্যই ক'জন বোঝে!" বলিয়া ভূপতি একটু হাসিয়াছে।

বিনতির ঘরে ঢুকিবার সময়ও বুঝি তাহার মুখে সেই হাসিটুকু লাগিয়াছিল। শুভ্র শয্যার সঙ্গে একেবারে যেন মিশাইয়া বিনতির দেহ পড়িয়া আছে। গলা পর্যন্ত সাদা চাদরে ঢাকা। শীর্ণ মুখটুকু চাদরের মতই বিবর্ণ।

কিন্তু ভূপতি গিয়া কাছে দাঁড়াইতে তাহার চোখে যে দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার অর্থ একান্ত দুর্বোধ। আশঙ্কাই তাহাকে বলিতে পারা যাইত কিন্তু তাহার সহিত দৃপ্ত অবজ্ঞার শাণিত ঝিলিক কেমন করিয়া মিশিয়া গিয়াছে। মৃত্যুর দ্বার হইতে বিনতি কি ইহাই সংগ্রহ করিয়া আনিল!

ভূপতি পাশের চেয়ারে বসে নাই। খানিক নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিয়াছে,—"আবার ত ফিরে যেতে হবে।"

"তাই ত ভাবছি।"—বিনতির স্বর অস্ফুট কিন্তু তবু অসাধারণ তীক্ষ্ণতা তাহাতে।

হাসপাতাল হইতে বিনতিকে তাড়াতাড়ি ছাড়িতে চাহে নাই। তাহার বিপদ না কাটিলে তাহারা ছাড়িয়া দিতে পারে না জানাইয়াছে। কিন্তু ভূপতি জেদ করিয়া সময় পূর্ণ হইবার পূর্বেই তাহাকে নানারকম চেষ্টা চরিত্র করিয়া বাড়ীতে লইয়া আসিয়াছে।

সেই ডাক্তার বলিয়াছেন,—"আপনি ভুল করছেন মশাই। স্নেহ ভালবাসা বড় জিনিষ, কিন্তু রোগ হাসপাতালের এই হৃদয়হীন কলের মত সেবাতেই সারে। আর কটা দিন রাখলেই ত আর ভয় থাকত না।"

ভূপতি অদ্ভুত উত্তর দিয়াছে,—"আপনাদের সব কথা যদি বিশ্বাস করতে পারতুম!"

কিন্তু বাড়ীতে ফিরিয়া দিন দিন আশ্চর্যভাবে বিনতি সবল সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। মৃত্যুকে এমন করিয়া তুচ্ছ করিবার জোর সে কোথায় পাইল কে

জানে? তাহার চোখে যে শাণিত অবজ্ঞা আজকাল উদ্ধত হইয়া আছে তাহাতেই কি তাহার সেই গোপন নূতনলব্ধ শক্তির ইঙ্গিত আছে!

স্বামী স্ত্রীর কথাবার্তা বন্ধ হইয়াছে মাত্র কয়েকদিন। ব্যাপারটা বোধ হয় এমন কিছু নয়। ভূপতি অফিস হইতে ফিরিয়া জামা কাপড় না ছাড়িয়াই একদিন বলিয়াছে,—"শীগ্‌গীর তৈরী হয়ে নাও, এখুনি বেরুতে হবে।"

অত্যন্ত অস্বাভাবিক আদেশ। গত দুই বৎসর স্বামীর সঙ্গে হাসপাতালে ছাড়া আর সে কোথাও গিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না।

বিনতি একটু বিদ্রূপের স্বরেই বলিয়াছে—"কোথায়?"

"বায়স্কোপের দুটো পাশ পেয়ে গেলাম এমনি। পয়সা দিয়ে ত আর হবে না। চল দেখেই আসি।"

"তুমিই দেখে এস।"—বলিয়া বিনতি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে।

ভূপতি দরজা আগলাইয়া বলিয়াছে,—"কেন, তুমি যাবে না কেন? আমার সঙ্গে যেতে কি ভয় করে নাকি?"

বিনতি হাসিয়াছে একটু। আজকাল সে হাসে। বলিয়াছে—"ঘরেই যখন কাটাতে পারলুম এতদিন, তখন বেরুতে আর ভয় কিসের?"

ভূপতি তাহার দিকে চাহিয়া কি যেন তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়া বলিয়াছে,—"তাহলে চলো না।"

"আচ্ছা চল।"

একবার ট্রাম বদল করিয়া আর একটা ট্রামে উঠিবার সময় বিনতি বলিয়াছে,—"কাছাকাছি বুঝি বায়স্কোপ ছিল না।"

"ছিল, কিন্তু, অমনি দেখবার পাশ ছিল না।"

সিনেমা সত্যই সহরের আর এক প্রান্তে। ভূপতি সেখানে গিয়া স্ত্রীকে উপরে মেয়েদের সীটে উঠাইয়া দিয়াছে। বিনতি একবার বলিয়াছিল,—"এক সঙ্গে বসলেও ত ক্ষতি ছিল না।"

"না নীচে বড় ভীড়, কষ্ট পাবে।"

বিনতি অদ্ভুতভাবে হাসিয়া সিনেমার ঝির সঙ্গে উপরে উঠিয়া গিয়াছে।

ভূপতি তাহার পর কি করিত বলা যায় না। কিন্তু পরিচিত একজনের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। লোকটা হাসিয়া বলিল,—"সখ ত মন্দ নয়, এই এতদূর এসেছিস বৌকে বায়স্কোপ দেখাতে।"

"তাঁহলে আর সখ কিসের!"—বলিয়া ভূপতি নিজেও বায়স্কোপের হলে গিয়া ঢুকিয়াছে। বন্ধুটিও পাশেই বসিয়াছিল সে একবার ভূপতিকে চিমটি কাটিয়া বলিয়াছে,—"অত ঘন ঘন ওপরে তাকাস নি। তোর বৌ পালিয়ে যাবে না।"

ভূপতি যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়া বসিয়াছে,—"না না ভারি লাজুক। ঠিক মত জায়গা পেলে কিনা দেখছিলুম।"

বায়স্কোপ আরম্ভ হইবার খানিক পরেই কিন্তু উসখুস করিতে করিতে হঠাৎ সে উঠিয়া পড়িয়াছে।

"আবার কি হ'ল?"—বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছে।

"কিছু না, আমি আসছি।"

বন্ধু হাসিয়া বলিয়াছে,—"বুঝেছি, এমন বায়স্কোপ দেখান কেন? ঘরে শিকলি দিয়ে রাখলেই পারতিস।"

ভূপতি আর কোন কথা বলে নাই। তাড়াতাড়ি হল হইতে বাহির হইয়া রাস্তার ধারে একটা ট্যাক্সিতে সটান উঠিয়া বসিয়া এক দিকে চালাইতে বলিয়াছে।

ট্যাক্সিতে ষ্টার্ট পড়িবার পরও ড্রাইভারকে থামিয়া থাকিতে দেখিয়া বিরক্ত মুখে ভূপতি কি যেন বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু সে কথা আর বলা হয় নাই। ট্যাক্সিচালকের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দরজাটা নিজেই খুলিয়া ধরিয়া হাসিমুখে সে বলিয়াছে,—"এসো, ঠিক সময়ে এসে পড়েছো।"

বিনতি ভিতরে উঠিয়া আসিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিয়াছে,—হাঁ তোমায় বেরুতে দেখলাম যে।"

"লক্ষ্য করেছিলে বুঝি?"

"তা করছিলাম।"

খানিকক্ষণ আর কোন কথা হয় নাই। বিনতি হঠাৎ বলিল,—"তুমি এমন

কাঁচা কাজ করবে ভাবি নি। তোমায় দেখতে না পেলেও কিছু আসতো যেত না। আমি বাড়ীর ঠিকানা জানি। তোমার নামটাও ব তে · পারতাম লোককে! এক সঙ্গে এমন করে না হোক খানিক বাদেই গিয়ে উঠতাম। সব দিক ভেবে বোধ হয় কাজটা করো নি।"

"না সবই ভেবেছিলাম। মনের ঘেন্নায় তুমি ত নাও ফিরতে পার, সেইটের ওপর জোর দিয়েই যা ভুল করেছিলাম।"

"মনের ঘেন্নায় মানুষ কি করতে পারে, কেউ জানে কি?"—বিনতির সেই বুঝি শেষ কথা। তাহার পর ট্যাক্সিতেই তাহারা বাড়ী ফিরিয়াছে নিঃশব্দে। মৃত্যুর মত সে নিঃশব্দতা সমস্ত সংসার এখন ভারাক্রান্ত করিয়া আছে।

অন্যান্য কথা হয়ত তাহারা আবার কহিবে, সংসারের প্রয়োজনে, পরস্পরকে আহত করিবার অদম্য প্রেরণায়, কিন্তু তবু অন্তরের এ নিঃশব্দতার ভার ঘুচিবার নয়। জীবনের একটি মাত্র বিলাস চরিতার্থ করিবার জন্য এ নিঃশব্দতার নির্বাসন তাহাদের নিঃসঙ্গ আত্মা স্বেচ্ছায়ই বরণ করিয়া লইয়াছে।

তাহারা পরস্পরকে আর বুঝি ছাড়িতেও পারিবে না। প্রেম নয়, তাহার চেয়ে তীব্র, তাহার চেয়ে গভীর উন্মাদনাময় বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার শৃঙ্খলে তাহারা পরস্পরের সহিত আবদ্ধ। সে শৃঙ্খল তাহারা ছিঁড়িলে আর বাঁচিবার সম্বল কি রহিল,—জীবনের কি আশ্রয়? পরস্পরের জন্য তাহারা বাঁচিয়া থাকিতেও চায়।

শেষ